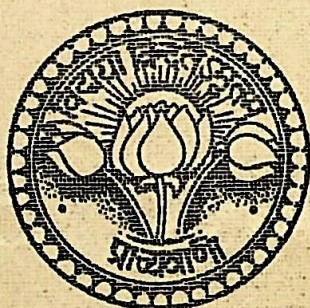


৭/১৭

প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা

দশম পুস্তক



শ্রীশ্রীানন্দাশ্রম

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ ; গভর্নমেন্ট সংস্কৃত

কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের

সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক

কলিকাতা

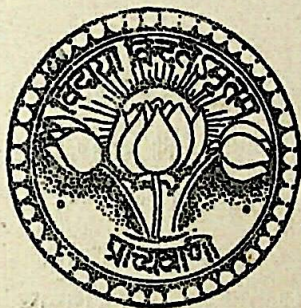
১৩৬৩

মূল্য :—দুই টাকা আট আনা।

৩৭/১৫

প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা

দশম পুস্তক



To
 Hoj Mowar
 Anandamayee
 J. S. S.
 1.10.60.

শ্রীশ্রীবুদ্ধ মনোমহরা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ ; গভর্নমেন্ট সংস্কৃত
 কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের
 সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক

কলিকাতা
 ১৩৬৩

মূল্য :—দুই টাকা আট আনা।

প্রকাশক :

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

“প্রাচ্যবাণী মন্দির”

৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২

প্রাপ্তিস্থান :

প্রাচ্যবাণী মন্দির,

৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২

দাসগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী

৫৪১৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চক্রবর্তী, চার্টার্ড এণ্ড কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চার্টার্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহেশ লাইব্রেরী

গ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

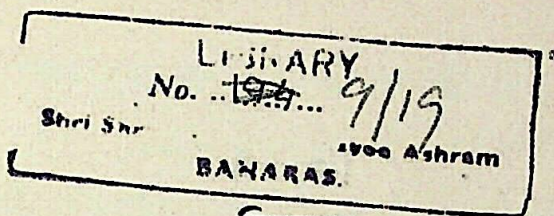
৩৮২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর :

শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, এম্. এ. (কম্.), বি. এল.

আই. এন. এ. প্রেস

১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬



নিবেদন

নমো ভগবতো অরহতো সম্মা সংবুদ্ধস্ম

বর্তমান ১৩৬৩ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০ তম বৎসর পরিপূর্তি উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সর্বত্র বৌদ্ধ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। সংবৎসরব্যাপী উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে বহু জায়গায় বক্তৃতা প্রদান করতে হয়। বর্তমান গ্রন্থ কয়েকটি বক্তৃতার সংকলন মাত্র। যদিও এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে, তথাপি ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ (২৪শে মে, ১৯৫৬) তারিখে বিকাল সাড়ে চার ঘটিকায় জিপুরা সরকার কর্তৃক আগরতলায় আহৃত জনসভায় প্রধান অতিথিরূপে "শ্রীশ্রীবুদ্ধ যশোধরা" বিষয়ে যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলাম এবং যা' এ গ্রন্থের সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়েছে, তদনুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে "শ্রীশ্রীবুদ্ধ যশোধরা"।

ভগবান্ শ্রীশ্রীবুদ্ধ ও ভগবতী যশোধরার পবিত্র জীবন ও উপদেশ ভারতবর্ষকে এক নব জীবন দান করেছিল। তাঁদের প্রচারিত ধর্মের ফলে ভারত জননী এখনও পর্বন্ত নিখিল বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ লোকের ধর্মজননী। ধর্মই ভারতবর্ষের প্রাণ। ভগবান্ বুদ্ধ ও ভগবতী যশোধরা ভারতের অন্ততম প্রাণারাম। তাই মহাপরিনির্বাণ জয়ন্তী বৎসরে আমরা তাঁদের শ্রীশ্রীচরণ কমলে প্রাণের অকৃত্রিম ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদন করি।

প্রাচ্যবাণী মন্দির,
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রিট, কলিকাতা—২
কলিকাতা, ১৩৬৩

শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবস্তুতি:	১
২। শ্রীশ্রীযশোধরাস্তুতি:	২
৩। শ্রীশ্রীবুদ্ধধ্যানম্	৩
৪। ত্রিপুরার প্রাচীন গৌরব	৪
৫। ভগবান বুদ্ধ ও যশোধরা	২
৬। বুদ্ধবাণী	২৭
৭। উদ্ধৃত বুদ্ধবাণীর মূলানুসন্ধান ও বঙ্গানুবাদ	৩৩
৮। গোতমের সাধনা ও আমরা	৪৬
৯। নির্বাণ পরিচয়	৫৬
১০। বৌদ্ধনারী কবি	৬৪
১১। বুদ্ধ পরম্পরা	৭১
১২। বুদ্ধ বংশ—গৌতম বংশ (বঙ্গানুবাদ সহ)	৭৫
—বুদ্ধ প্রকীর্তক খণ্ড (”)	৮০
—বুদ্ধদেবের ধাতুবিভাগ	৮৪
১৩। ত্রিপিটক	৮৮
—বিনয় পিটক	৯০
—সুত্ত পিটক	৯৪
(ক) দীঘ-নিকায়	৯৪
(খ) মজ্জিম-নিকায়	১০০
(গ) সংযুত-নিকায়	১১৩
(ঘ) অঙ্গুত্তর-নিকায়	১১৫
(ঙ) খুদ্দক-নিকায়	১১৫
—অভিধম্ম পিটক	১১৫
১৪। ত্রিপিটক প্রচারের ইতিহাস	১১৭
১৫। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য	১২৩
১৬। শ্রীশ্রী বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ	১৪৪

আগরতলা বুদ্ধজয়ন্তী

৭/১১

প্রধান অতিথি :—

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরীর ভাষণ, গান

এবং উৎকৃত বঙ্গানুবাদাদি সহ বুদ্ধবাণী

স্থান—বেণুবনবিহার, ২৪শে মে, ১৯৫৬

বুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ, গান ও বুদ্ধবাণী

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব-স্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চতুর্থীণ-বিরচিত।

নমঃ শ্রীবুদ্ধদেবায় শাস্ত্রতবিশদীপায় নমঃ

তথাগতায় শাক্যসিংহায় যশোধরাজদয়স্থানিধয়ে নমঃ ।

জাতে বেদদীপালোকে ক্ষীণে আবিরাসীক্সং ভূমণ্ডলে

চক্ৰে সনাথং জগদনাথং রণঞ্জহ নির্মলং মলময়ং

দিদীপিষে পূর্ণপ্রজ্ঞ পুণ্যলোকেন বিশ্বনিকেতনং

শুদ্ধোদনতনয়ায় মায়াজীবনাভরণায় যুগহিতায় তুভ্যং

নমো নমঃ নমো নমঃ ।

করুণাবরুণালয় সর্বজনসমাশ্রয়

আর্তদীনাবলাজন-বিলোকন-নীরাজন

বিপুলপুলকততিজ্যোতির্ময়নিরঞ্জন

কপিলাশ্রমশাকবৃক্ষনিবাসিমনোমোহন

পতিতপাবন শ্রীবুদ্ধদেব

তুভ্যং নমো নমঃ ॥

শ্রীশ্রীযশোধরা-স্তুতিঃ

উক্তরশ্রীযভীল্লবিমলচতুর্ভুজ-বিরচিতা

আত্মশক্তে যশোধরে নমোহস্ত তে

অং হি শতাকী রক্তদন্তিকা শাকংভরী ভ্রামরিকা

রণদুর্জয়া চামুণ্ডা চণ্ডিকা

প্রশান্তে শিবে স্থিররূপা গোপা প্রশান্তহৃদয়া

শ্রীবুদ্ধৈকজীবিতা জননি তুভ্যং নমঃ ।

বিবাহবাসরসজ্জিতে স্তম্বিতে তুভ্যং নমঃ ॥

জগ্নাস্তরে আকাজ্জিতে গৃহীতঃ প্রতিশোধঃ

তেন পরমতুষ্টো বুদ্ধো জীবনাধিকঃ ।

নির্জিতঃ স্তন্দরানন্দো দেবদত্তোহপি

পশ্যামি স্মিতাননং জগজ্জননি তে ॥

কা শোভা তে ন বভূব জননি

যদা ত্রয়ানীর্ব্যাভ্রী শাক্যসিংহশ্চ সিংহঃ ।

অহো দুরাশা বৃষভরূপিণঃ স্তন্দরশ্চ

হস্তিরূপধারিণোপি দেবদত্তশ্চ ॥

স্মরামি তে কদিতং পিতা মহানামা

স্বভূতিনামধারী প্রত্যখ্যাদ যদা সিদ্ধার্থম্ ।

হৃদয়সমুদ্রেণ তে লজ্জিতঃ কিং সমুদ্রোহপারঃ

সিদ্ধার্থো যদা শাক্যসিংহঃ করিবিজয়ী বভূব ॥

সংরক্ষ ধর্মং সংরক্ষ সজ্জং

রক্ষ চ জননি বর্ষং ভারতনামাক্ষিতম্ ।

সংরক্ষ বিশ্বং হিংসাদেষকলুষিতং

জননীং বিনা কো রক্ষেৎ সন্তাননিচয়ম্ ?

জননি যশোধরে পাহি বিশ্বং

বিশ্বজননি জননি নমোহস্ত তে

আত্মশক্তে যশোধরে নমোহস্ততে ॥

শ্রীশ্রীবুদ্ধধ্যানম্

উক্তরশ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুর্থরীণ-বিরচিতম্ ॥

কপিলবাস্তুলোকেশস্থেশ তুভ্যং নমঃ

কণ্টকগামিনে কান্তারবিলাসিনে সর্বলোকস্বামিনে তুভ্যং নমঃ

অং প্রাসোষ্ট ধর্মং ত্রিভুবনৈকাবলম্ব্যং জগজ্জনমনোলোভং

যশ্রাদৌ কল্যাণং মধ্যেহন্তে চ কল্যাণং কল্যাণমধুমন্তম্ ।

গয়াধামোরুববেষে সম্যকসম্বুদ্ধ

কাশীসিপন্তনমৃগদাবে ধর্মপ্রবর্তক

সারিপুত্ত—মোগ্গলায়নানন্দচিরানন্দ দেহি চানন্দম্ ।

জগৎপাবক দুঃখনিবারক পাহি বিশ্বং

সমুদ্রাসয়াত্মাণবিকমারণাজসত্ত্বং সমন্তম্ ॥

অমিতাভ বিনাশয়াঘং ভ্রাতৃবিনাশহিংস্রহিংসাবিমিশ্রং

তথাকথিত-সভ্যতা-বিজৃম্বিত-স্বার্থসর্বস্ব-মমতাবিহীনং

বিকির অমিতাভা দিগ্দিগন্তেষু নিরন্তরম্ ।

চিরনবীননবীনং প্রচারয় তে শাস্ত্রমনিশং ত্রিপিটকনামধারি

চতুরশীতিসহস্রসংসংভারি জ্ঞানবিভবপ্রপূর্ত্যন্ত্যপারি ।

কোটিকোটিমনঃকুটিকুট্যন্তরংস্থিততমোবিশ্বংসনকারি

পারণ তারণ ধারণ কারণ হে ভবকাণ্ডারিন্ পঞ্চস্কন্ধচিরপ্রহারি ॥

তবাগি জননী ভারতজননী চিরহাস্তবিলাসিনী

বীরপ্রসবিনী বিকিরতু আশিষো বিশ্বসমুদ্রাসিনী

মহাপুত্র মহাবীর মহাভিন মহাদীর নন্দয় তাম্

বন্দেভাষ্যম্ ॥

ভগবান্ বুদ্ধ ও যশোধরা ॥

ত্রিপুরার প্রাচীন গৌরব

ত্রিপুরার গৌরবে বঙ্গদেশ চিরকাল গৌরবান্বিত ।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা কীৰ্ত্তিধর বা সেন্ধুমফার সময়ে হীরাবন্ত ঋষি বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের আগরতলা আক্রমণের জন্ত অতুরোধ জানিয়ে ভিতরের সমস্ত সন্ধান জানিয়ে দেয় । সেন্ধুমফা ভয় পেয়ে শত্রুর হাতে রাজ্য সমর্পণ করার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হন । রাণী ত্রিপুরসুন্দরী এই সংবাদ জেনে রাজাকে তিরস্কার করে বললেন—

“অখ্যাতি রাখি চাহ আমি বংশে তুমি ।

বলে, আসি দেখ রঙ্গ যুদ্ধ করি আমি ॥”

পুত্ররূপী প্রজাপুঞ্জকে জননী ত্রিপুরসুন্দরী সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললেন—

“মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ।

কি করিব পুত্র সব কহ বিবেচিয়া ॥

গোড়সৈন্ত আসিয়াছে যেন যম কাল ।

তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল ॥

যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে ।

যেই জন বীর হস্ত চল আমি সনে ॥

রাণীবাক্য শুনে সবে বীরদর্পে চলে ।

প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধে যাইব সকলে ॥”

এরূপ শূর রমণী অনায়াসেই করলেন স্বীয় রাজ্য রক্ষা এবং মাতৃরূপে সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে সগৌরবে শাসন করতে লাগলেন । এ বীর রমণী ঋষিদের যুগের বিম্বালা ও বক্রিমতীর মতই বন্দনীয়—ঈশ্বর যুদ্ধে পা হারিয়ে লোহার

ত্রিপুরার প্রাচীন গৌরব

৫

জম্মা পরিধান করেও স্বদেশের জন্ত যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিলেন। জননী অহল্যাবাই পরবর্তী যুগে এঁদের পুণ্য আদর্শই তো অনুসরণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নৃপতি ধনুমাণিক্য শক্তিদেবীর মন্দির স্থাপন করেন। এই মন্দিরে স্থাপিত দেবীমূর্তির প্রস্তর আনা হয় চট্টগ্রাম থেকে, যে স্থান সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—“চাটিগ্রামপুরী ধনু, জলে জলতি পাবকঃ”।

রাজমালার ধনুমাণিক্য খণ্ডে আছে—

“চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।

প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট ॥

তথা হতে আনি আমি এই মঠে পূজ।

পাইবা বহল বর যেই মত ভজ।”

কলতঃ দেখা যায়—ত্রিপুরার রাজারা কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নি। হিন্দু, বৌদ্ধ মুসলমান—সর্ব ধর্মের প্রতি তাঁরা সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। অতীতকাল আগে ত্রিপুরাধিপতি বেণুবনবিহার প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি স্বীয় পরিবারের পুরুষ-পরম্পরাগত আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন। পূর্বকাল থেকেই চতুর্দশ দেবতা আগরতলার অধিষ্ঠিত আছেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে যখন আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দাবানলে সমস্ত ভারতবর্ষকে বিদগ্ধ করে তুলেছিলেন, তখন ত্রিপুরাধীশ গোবিন্দমাণিক্য স্বজ্ঞাকে আশ্রয় প্রদান করে আশ্রিতবাৎসল্যের প্রকর্ষ প্রদর্শন করেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে ভয় প্রদর্শন করে যে পত্র দেন, তিনি ‘তো তা’ গ্রাহ্যই করলেন না, বরং কায়মনোবাক্যে স্বজ্ঞার হিতসাধনকল্পে বন্ধপরিকর হন। সাহজাদা স্বজ্ঞা এবং গোবিন্দমাণিক্য ভয়ে একই সময়ে একই কারণে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হন। স্বজ্ঞা যখন আরাকানে, তখন নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্যও সেখানে ছিলেন। যে গোবিন্দমাণিক্য রোসাক্ষের (আরাকান) রাজার নিকট সাহসজ্ঞাকে সম্মান দেখিয়ে আসন

ছেড়ে দাঁড়ান এবং তা' দেখে রোসাদ্রাজ বিশ্ববিমুঢ়চিত্তে প্রস্থ করেন—

“রসাদ্রের মহারাজা বলিল আপন।

কি কারণে স্লেচ্ছরাজা দিচ্ছ সিংহাসন”—

এবং প্রত্যুত্তরে গোবিন্দমাণিক্য বলেন—দারার অবর্তমানে স্বজারই রাজসিংহাসনে আয়্য অধিকার এবং তিনি আয়ের পক্ষপাতী—সেই স্বজাকে গোবিন্দমাণিক্য জীবনে ভুলতে পারেননি। বন্ধুত্বমাখা বন্ধে থাকে তিনি একবার খ্রীতিসম্ভাষণ জানিয়েছেন, জীবনে মরণে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান ও খ্রীতি তিনি প্রকাশ করেছেন, মুখে শুধু নয়—বেশীর ভাগই কাজে। স্বজা গোবিন্দমাণিক্যকে একটি পারশ্ব দেশীয় তরবারি এবং বহুমূল্য হীরকালুপি উপহার দেন। এই বন্ধুদানের ঔজ্জল্য তাঁর হৃদয়দেশ চিরকাল দেদীপ্যমান করে রেখেছিল। গোবিন্দমাণিক্য ১৬৬৬ (খ্রীষ্টাব্দে ১৭০৬ খ্রিপুরাব্দে) সিংহাসন ফিরে পান। অনতিবিলম্বে তিনি গোমতী নদীর তীরে স্বজা মসজিদ স্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য—স্বজার উপহারের জিনিষ তিনি পরম আদরে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং এখনও রাজপরিবারে সেই ধন অক্ষয় গৌরবে বিরাজমান আছে।

রাজমালার উদয়মাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে—

“রাজ্যমাটি নাম রাজ্য পূর্বাধি হৈল।

উদয়মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল ॥”

কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে উল্লিখিত রাজধানীর সমীপবর্তী জনপদ-সমূহে নানাপ্রকারের রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় তদানীন্তন খ্রিপুরেশ কৃষ্ণমাণিক্য তাঁর পূর্বপুরুষগণের রাজধানী ‘উদয়পুর’ থেকে আগরতলায় সরিয়ে আনেন।

“এগারশ সত্তর সন (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে) হয়েত যখন।

আগরতলা রাজধানী করিল রাজন ॥”

ত্রিপুরার প্রাচীন গৌরব

৭

কুৎস মালাগ্রন্থেও লিখিত আছে :—

“তারপরে রাজ গেল আগরতলায়।

বসতি কারণে পুরী করিল তথায়” ॥

এই প্রসঙ্গে “আগরতলা” নামের উৎপত্তির ইতিহাসও প্রণিধানযোগ্য। কারো কারো মতে অগুরু গাছের আধিক্য ছিল বলে এই স্থানের নাম “আগরতলা” হয়েছিল। অন্যমতে “আগর মামুদ” নামক জনৈক মুসলমানের নামানুসারে এইস্থানের নামকরণ হয়েছিল। কিন্তু যেটি সত্য কারণ বলে মনে হয়, সেটি হচ্ছে এই—যা রাজমালায় উল্লিখিত আছে—মহারাজ ভাস্কর ফা তাঁর ১৭ জন পুত্রের মধ্যে আগর ফা নামক পুত্রকে এই স্থান ভাগ করে দিয়েছিলেন—

“আগর ফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল”—

(রাজমালা ভাস্কর ফা খণ্ড)

একদিকে ত্রিপুরার রাজন্যবৃন্দ এই সেদিন পর্যন্ত ৬দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অকাতরে সর্ববিষয়ক সহায়তা প্রদান করে বঙ্গদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার অক্ষয় করার পথ কুসুমাস্তীর্ণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে পূর্বকাল থেকেই নানা প্রকারের স্থানীয় গীতি, ও পল্লীগীতি সাহিত্যের কলেবর সংপুষ্ট করেছে। উদাহরণক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক থেকে গোপীচাঁদ সংক্রান্ত ময়নামতীর গানের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। স্থানীয় সাহিত্যের দিক থেকে রেসিয়ার খাগড়া গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধে নিহত সৈনিক পুরুষের উদ্দেশ্যে বিধবা পত্নী কর্তৃক গীত হৃৎকম্প বিরহ সঙ্গীত সহৃদয় মানব হৃদয় অনার্যাসে করে বিকৃত, বিগলিত। উদাহরণক্রমে একটি গান উদ্ধৃত করছি—

“হাছুক্ কলক্ মাইম্‌ই পিংজাগই

পাগডী হুরগলিয়া, যাহ্ পাগডী হুরগলিয়া।

হাছুক্ কলক্ শুন্থু পিংজাগই

যাকুরাই হুরগলিয়া, যাহ্ যাকুরাই হুরগলিয়া।.....” ইত্যাদি

ডক্টর চৌধুরীর ভাষণ

বিরহিণী পতিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—“দীর্ঘ পার্বত্য পথে কাউন বপন করাতে তার পাগড়ী দেখতে পেলাম না ; দীর্ঘ পার্বত্য পথে দুপাটি ফুলের গাছ বপন করাতে তার গোড়ালি দেখতে পেলাম না। কলকলনাদিনী ঝরণার ধারে ঘাট প্রস্তুত করাতে ডাকছি তাকে ; সে যে শুনতে পাচ্ছে না। ঘাটে অনেকগুলি পাথর থাকাতে আমি দৌড়েও তার কাছে পৌছাতে পারলাম না। ঘোর কুয়াসার জন্ত আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে দেখতে পেলাম না।”

অথও বঙ্গদেশের এই অংশ আজ সৌভাগ্যক্রমে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত হয়েও ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এদেশের কুষ্টি ভারতের শাস্ত্র কুষ্টির প্রোজ্জলতম দীপশিখা এখনও আবহন করে চলেছে। স্বাধীন ভারতে এখন আমাদের বিশেষ কর্তব্য বঙ্গদেশের এই শাস্ত্র গৌরবাবহ স্থানের সমস্ত কুষ্টির যুগান্তবাহী ধারার বিশ্লেষণ পূর্বক তার সঙ্গে একাত্মবোধ বিবৃদ্ধি। বঙ্গদেশের অধীনমাজের দৃষ্টি আমি এবিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। পার্বত্য অঞ্চলের বহু নরনারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ছেলেবেলায় দেখেছি, চট্টগ্রামের “মহামুনি” নামক স্থানে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সহস্র সহস্র সংখ্যায় বার্ষিক মেলায় যোগদান করতেন এবং শ্রীশ্রীবুদ্ধের সমক্ষে নৃত্যাদি সমারোহপূর্বক জীবনের মত সহধর্মিণীকে বরণ করে নিতেন। শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের স্মৃতিপূজার এই পুততম বাসরে পার্বত্যাঞ্চল সকলের সঙ্গে বঙ্গবাসী মাত্রেই হৃদয়িকতম মিলন প্রার্থনা করি ॥

ভগবান্ বুদ্ধ ও যশোধরা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রত্যেক মানুষেরই যেমন চরিত্রগত একটা বৈশিষ্ট্য থাকে তেমনি দেখা যায় জাতিহিসাবেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যা' সে জাতিকে অনন্য করে তোলে। 'ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ স্বভাবগত আধ্যাত্মিকতা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সাক্ষী। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের পূর্বে ভারতবাসী বেদান্তশাসনে পরিচালিত হতেন। কালক্রমে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড প্রচণ্ডাকার ধারণ করে। এবং ভারতবাসী কর্মের তাৎপর্যবোধ ও বিচারে বিমূখ হয়ে কেবলমাত্র অন্ধকরণপ্রিয়তার অভ্যাসবশে বাহ্যিক বৈদিক যাগাদির প্রতি একান্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তার বহিরঙ্গ সাধনগুলির মাদকতায় সোমরস পানে মত্ততা এবং পশুবৎ প্রভৃতির উৎকর্ষতা অহুষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করেছিল। ধর্ম সাধন করতে গিয়ে সমগ্র জাতি নিষ্ঠুরতার ডুবে যেতে লাগল। সদাচরণের প্রবৃত্তিও অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল, সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণও নিম্নস্তরে অবনমিত হ'য়ে পড়লেন। দেখা যায় সমাজ বা রাষ্ট্রে যখনই একরূপ একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন সেই সমাজের মধ্যে কোনরূপ যুগান্তকারী বিপ্লব একান্ত অনিবার্য হ'য়ে উঠে, বিপ্লব ভিন্ন নতন করে সমাজের কাঠামো তৈরী করা দুঃসাধ্য, সামগ্রিক কল্যাণসাধন অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। প্রাকৃতজ্ঞান সাধারণতঃ ধর্মান্ততার জন্তে বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হ'তে পারে বা তা' অকিঞ্চিৎকর বলেও মনে করতে পারে, যেমন বর্তমান যুগেও ধর্মান্ততার ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করা গেছে কিন্তু প্রাজ্ঞজন অতিমাত্রাবিক বুদ্ধির অধিকারী—, এই সব পাশবোচিত আচরণে তাঁদের হৃদয় কেঁপে উঠে তাঁরা শোকে আচ্ছন্ন না হ'য়ে জগদ্ব্যাপী সে দুঃখের মহাতাপ্তব দেখে জাতির পরিণাম লক্ষ্য করে লোকোত্তর

সাধনায় হন ব্রতী। আর একথাও একান্ত সত্য যে স্বাভাবিক নিয়মামুসারেই দেখা যায় সমাজ কখনো একই অবস্থায় স্থির থাকতে পারে না। মাহুশের মনেরও যেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তেমনি সমাজেরও উত্তরোত্তর পরিবর্তন এসে থাকে, এই পরিবর্তনের মহাসঙ্কটলগ্নে অসহায় মানবের দুঃসহ মনোবেদনা সন্নেহে মুছিয়ে দেবার ভার নিয়েই এসে থাকেন কোন মহামানব। এমনি এক বিপৎসন্ধিতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন সর্বমানবের পরিজ্ঞাতা শাক্যসিংহ।

ফলত বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র ধর্ম সৃষ্টি করার জন্ত কোনও ধর্ম প্রচার করেন নি। একদিকে তিনি যেমন পশুবন্ধের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি অমৃতোপদেশময় মহাবাগীর স্নেহরসে সিক্ত করে দিয়েছিলেন সর্বপ্রাণীর বিমুক্ত হৃদয়।

শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে ইনি শাক্যসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হ'য়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন ইক্ষাকুবংশীয়। পিতৃশাপে কপিলমুনির আশ্রমে শাক্য নামক^১ বৃক্ষকে আশ্রয় করে বসবাস করেছিলেন বলে এই পরিচয়, এবং এই কপিলমুনি গৌতমবংশীয় বলে তাঁর আশ্রিতদেরও গৌতম আখ্যা হ'য়েছিল। এ জন্তে অনেকে শাক্যেরই অপর নাম ছিল গৌতম—একপ নির্দেশ করে থাকেন। আচার্য ভরত এসম্বন্ধে বলেছেন—“শাক্যবংশস্তাং শাক্যঃ, শাক্যচ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ। তথাহি—শাকো নাম বৃক্ষ-বিশেষঃ, তত্র ভবো বিজ্ঞানঃ শাক্যঃ। পিতুঃ শাপেন কশ্চিদিক্ষাকুবংশীয়ো গৌতমবংশজকপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসশ্চ শাক্য উচ্যতে^২, তদুক্তং—শাকবৃক্ষে প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষাকুবংশস্তাং ভূবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।” কপিলবস্তুর রাজা ছিলেন শাক্যসিংহের পিতা; শুদ্ধোদন, তিনি বিশেষ নিষ্ঠাবান ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন। অতিশয়

১। পালি সাহিত্যে এই নামের ভিন্ন ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হয়।

২। দৌষনিকারে অষ্টটি—হুন্তে সামান্ত ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

শুদ্ধ ও দন শুদ্ধ করতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল শুদ্ধোদন। আৰ্য অভিধানে পাওয়া যায়—“শুদ্ধোদনো, যতোভুঙ্তে ত্রায়বান্ শুদ্ধমোদনম্”—ইত্যাদি।

একটি প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়—শাক্যসিংহ ভ্রমণে নির্গত হ'য়ে ক্রমে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত ও সন্ন্যাসী এই চারিশ্রেণীর মানব দর্শন করেন। তা'তে একদিকে মানব শরীরের দুঃখময় পরিণাম এবং অপরদিকে শাস্তিময় আদর্শ মূর্তি দর্শন করে তিনি চিন্তাশ্রিত হন। ক্রমে তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং ২৯ বৎসর বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেছিলেন এই জরা ব্যাধি প্রভৃতির অস্তিত্ব না থাকলেও সংসার দুঃখময় বলে তিনি সংসার পরিত্যাগ করে দুঃখনিবৃত্তির সাধনাই করতেন—

“যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধিন্ মৃত্যু—

স্তথাপি চ মহদুঃখং পঞ্চক্লেশং ধরন্তঃ।

কিং পুনর্জরা-ব্যাধিমৃত্যুনিত্যাহবন্ধাঃ—

সাধো প্রতিনিবর্তস্ব চিন্তয়িত্ত্বো প্রমোচম্॥”

তিনি যে যুগে উদ্ভূত হয়েছিলেন সে যুগে—অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে লোজু এবং কনফুসিয়াস, গ্রীসে পারমেনিডেন ও এম্পোডেকলস, ইরাণে জুবথ্টা ও ভারতে মহাবীর ধর্মালোচনে ছিলেন ব্যাপ্ত।

সমগ্র পৃথিবী যখন ধর্মচঞ্চল, তখন, বোধি বুদ্ধের তলায় এক ভোর বেলায় বুদ্ধের জ্ঞানচক্ষু হয়ে গেল উন্মীলিত, বললেন তিনি আমি কানী গিয়ে এমন এক প্রদীপ জালবো, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করবে। আমি এমন এক ঢকা নিনাদ করবো, যা' স্থপ্ত মানবজাতিকে করবে জাগ্রত। আমি নীতি শিক্ষা দেব। আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি। আমি ধর্ম প্রচার করবো।” তারপর ৪৫ বৎসর সর্বত্র পরিভ্রমণ করে তিনি দান মাহাত্ম্য, ত্যাগের আনন্দ, সরলতা ও মৈত্রীর উপদেশ দেন, সকলকে শিক্ষা দিয়ে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়ে দেন। আশী বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব কুশীনগরে করলেন পরিনির্বাণ লাভ। বৈশালী

নগর থেকে আনন্দকে সঙ্গে করে গেলেন পাহাড়ে এবং আনন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন—

“চিত্রং জঘ্নুদ্বীপং মনোরমং জীবিতং মনুষ্যাণাম্॥”—বিচিত্র দেশ এ ভারতবর্ষ, মনুষ্যদের জীবন এখানে মনোরম—এ সান্ত্বনা জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর ছিল। হিরণ্যবতী নদীর তীরে শালবনে বুদ্ধদেব দুই বৃক্ষের মধ্যে নিজের জন্তু করলেন অন্তিম শয্যা বিরচন। বললেন আনন্দকে—“আনন্দ, কেঁদোনা। হতাশ হয়োনা। মাল্লুষ যা কিছু ভালবাসুক না কেন, তা’তো তাকে ছেড়ে যেতেই হবে, তোমরা নির্বাণলাভের জন্য সতত প্রযত্নশীল থেকে—”এ হলো বুদ্ধের জীবনের শেষ বাণী।

বৌদ্ধ-দর্শন

আর্য দার্শনিক সম্প্রদায় প্রায় সকলেই জগৎকে দুঃখময় বলেছেন, এজ্ঞে সাংখ্যদর্শন জীবিত দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করেছেন। বেদান্তদর্শন ও তা’ই। ত্রায়-বৈশেষিকও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি পদার্থ বলে নিদ্বন্দ্বিত করেছেন। মীমাংসকগণও “যন্ন দুঃখেন সংভিন্নম্” ইত্যাদি দ্বারা দুঃখাতীত স্তরের সন্ধানে জগৎ ছেড়ে স্বর্গে ধাবমান হ’য়েছেন। বৌদ্ধ-দর্শনের ও ঐ একই কথা—জগৎ দুঃখময়। বুদ্ধদেব জগতের এই দুঃখদর্শনে বিচলিত হ’য়েছিলেন। কোন সময়ে এই চিন্তায় বিভোর বুদ্ধদেব ধ্যানগত চিন্তে নিবিষ্ট হয়ে ভাবলেন কি দুঃখময় এই জন্ম-মৃত্যু আর জন্মমৃত্যু! এর কবলে পড়ে জীবের কি দুর্গতি! তার জন্তেই জরা ব্যাধি শোক তাপ! কিন্তু হায়, এথেকে পরিত্রাণের উপায় এরা জানে না! গভীর চিন্তার পর, শাক্যসিংহ ভাবলেন—কি কারণে এই জরা ব্যাধি!—“জরামরণং কিংমূলকম্?”, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল—“জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণম্।” জাতিমত্তাই জরামরণের কারণ। এই জাতিরই বা কারণ কি? “জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া।” ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। জাতি অর্থাৎ জন্মবদ্ধ বা বেঁচে থাকা। এভাবে

উৎপত্তির বীজ হ'ল উপাদান অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ধাতু বা মৌলিক পদার্থ-গুলি। উপাদানের মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল বেদনা বা সূখ দুঃখাদির অহুভূতি। বেদনার মূল স্পর্শ অর্থাৎ আসক্তি, তার মূল ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি। তার বীজ নামরূপ, নামরূপের বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের বীজ অবিজ্ঞা। সুতরাং এই অবিজ্ঞা বিনষ্ট হ'লেই মূলবীজ নষ্ট হওয়াতে সর্বধ্বংস—সর্বধ্বংসে শূন্যতা জন্মাত্ত্যভাব—দুঃখনাশ, তাই পরিনির্বাণ বা মুক্তি। এই শূন্যতা বা নির্বাণই বৌদ্ধ সাধনার লক্ষ্য।—“অবিজ্ঞায়ামসত্যং সংস্কারো ন ভবতি, অবিজ্ঞানিরোধঃ সংস্কারনিরোধঃ, সংস্কারনিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ” ইত্যাদি—। এভাবে দুঃখনাশের দ্বারা পরিনির্বাণ লাভে সবই বিনষ্ট হয়ে যায় বলে একেবারে সর্বাত্মক অভাব বা সর্বশূন্যতা; তা'তে আত্মা ও থাকে না—অভাবরূপতাই থাকে।

বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের সন্তান, হিন্দু হয়েই জন্ম মৃত্যু পরিগ্রহ ও শিক্ষা-প্রদান করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্ষসভ্যতার তিনি নব ব্যাখ্যাতা মাত্র। যে ভারতীয় ধর্মের লক্ষ্য অতুল শান্তি, অভয় মোক্ষ, নির্বাণ—পৃথিবীর সমস্ত গ্লানি, দৈত্যের উৎসে অবস্থান, শাস্ত্রত ব্রাহ্মী স্থিতি—অন্ধকার থেকে আলোকে অগ্রসর হওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা—বুদ্ধদেব ভারতের সে চিরন্তন ধর্ম এবং ধর্মপথের প্রচেষ্টাকে জগতের ধর্ম এবং জগতের শাস্ত্রত প্রচেষ্টার রূপদান করার মৌলিক উপাদানগুলি স্বকীয় জীবনে প্রচার করেছিলেন, এবং পরে পরে অশোকাদির প্রচেষ্টায় নিখিল বিশ্ব তা' গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে, শান্তির পেয়েছে, সন্ধান। বুদ্ধদেব ছিলেন “ব্রহ্মভূত”—স্বয়ংপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আন্তর পদার্থ—স্বকীয় উপার্জনের বিষয়। তিনি আজীবন অজ্ঞতা, সংস্কার ও ভীতির বিরুদ্ধে করেছিলেন বিদ্রোহ ঘোষণা। বুদ্ধদেব ঘোষণা করেছিলেন—জগতের কিছুই চিরন্তন নয়—

কারো এক জীবনের কাজ দ্বারা চিরন্তন ভাগ্য নির্দিষ্ট হয় না। তিনি অদৃষ্টবাদ মানতেন না। তিনি বলতেন—মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করবে; সময় ও সংসার সেই জয় করবে নিজের চেষ্টায়। অপরিবর্তনীয় আত্মায় তিনি বিশ্বাস করতেন না—সংচিন্তা ও সংকল্প দ্বারা আত্মা হচ্ছে গঠিত। তবে তিনি বলেন—এমন একটি অন্তর্নিহিত নীতি আছে, যা' ঘটনা প্রবাহে থাকে অবিকল, অবিচলিত, বাহ্য অবস্থার নিষ্পেষণে যার ব্যত্যয় ঘটে না, বাইরের জগতের উপর তা' নির্ভর করে না—যা' স্বয়ংসক্রিয়। যে আত্মনিয়ন্ত্রণসমর্থ, সেই বুদ্ধত্বলাভের অধিকারী। সেই বথার্থ সন্ন্যাসী, যার অন্তঃকরণ নিজের ক্ষমতাধীন।

বৌদ্ধমতানুসারে জগতের মূলতত্ত্ব দু'টি—চিন্তা ও ভূত। ভূত থেকে ভৌতিক পদার্থ আর চিন্তা থেকে আধ্যাত্মিক বা চৈতন্য পদার্থ সৃষ্ট হয়েছে। “ভূতং ভৌতিকং চিন্তং চৈতন্যং”। এই চিন্তাই রূপাদি পঞ্চস্ফদাত্মক। পঞ্চ স্ফদের মধ্যে বিজ্ঞান স্ফদাই আত্মা। অর্থাৎ “আমি আমি” “আমার আমার” এই প্রকার অহংভাবাপন্ন সর্বদা উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহের নামই বিজ্ঞানস্ফদা বা আত্মা। এঁদের মতে আত্মার নিত্যতাও নেই স্থিরতাও নেই। ভাব পদার্থ মাত্রই অর্থক্রিয়াকারিতাবিহীন। সুতরাং এই ক্রিয়া সামর্থ্যটি হয় ক্রমশঃ প্রকাশ্য, অথবা যুগপৎ বা এক কালেই বর্তমান। বস্তু স্থিরতাব্যুক্ত হ'লে সর্বদাই সে সামর্থ্য থাকতে বাধ্য, তা'তে সর্বক্ষণই—অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যৎ—ত্রিকালেই অর্থক্রিয়াকারিতাপত্তি ঘটে, অথচ তা' দৃষ্ট হয় না, এজগৎ বলা হয় প্রতিক্ষণই বস্তু পরিবর্তিত হ'চ্ছে, সুতরাং পূর্বক্ষণের বস্তু আর বর্তমানে নেই, পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এভাবে প্রতিনিয়ত রূপান্তর চলেছে। কিন্তু এই রূপান্তর প্রতিনিয়ত চলতে থাকলেও একটা ঘটনা স্রোত যেন অব্যাহত থাকে, যেমন রক্ত কার্পাস বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে নিষ্পন্ন কার্পাসা নালই হ'য়ে থাকে, বীজ নষ্ট হয়ে গেলেও তজ্জনিত রক্ততা অল্পম্যত থেকে যায়, তেমনই পূর্বক্ষণস্থ কারণরূপী আত্মা উত্তরক্ষণস্থ কার্যরূপী আত্মাকে

নিয়মিত করে, তাই প্রবাহধারা লক্ষ্য করেই স্থিরত্ববুদ্ধি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কণিক পদার্থে এই যে স্থিরত্ব বুদ্ধি তাই হ'ল অবিজ্ঞা। এই অবিজ্ঞাবশতঃই রাগদ্বेषাদি জন্মে, তা' থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই মূল ধাতুগন্ধক বা আকাশকে আবরণাভাব মাত্র ধরে নিলে ধাতু চতুষ্টয়কে সংস্কৃত করে পরস্পরের স্বভাব প্রকাশের, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ধাতুর স্ব স্ব কার্য নির্বাহের, উপযোগী সামর্থ্য সৃষ্টি করে দেয়, তা' থেকেই মনুজ্য সৃষ্টি। এভাবে দেখা গেল স্বভাবতঃই যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি কার্যকারণভাবে আবদ্ধ, যেমন অবিজ্ঞা সংস্কার উৎপত্তির হেতু, তেমনি সংস্কার ও অবিজ্ঞান্তর উৎপত্তি হেতু—এই কার্যকারণ চক্র। কারণ বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতি নিপ্পন্ন এজ্ঞাত্ব বলা হয় প্রতীত্য। তাই পরিদৃশ্যমান জগতের জ্ঞানপূর্বক রচয়িতা ও কেহ নেই, এদের মতে এজ্ঞাত্ব স্বতন্ত্র কোন সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্তা ঈশ্বর কখনো স্বীকৃত হয়নি।

‘বোধিচিহ্ন বিবরণ’ গ্রন্থে ধর্মকীর্তি বলেছেন—বুদ্ধের বহু শিষ্যের মধ্যে চারিজনই পথ প্রদর্শক আচার্য, “মৌত্রাস্তিকো বৈভাষিকো যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ”। বুদ্ধদেবের উপদেশের শিষ্যভেদে ব্যাখ্যাভেদ হওয়াতে এরূপ চারিটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছিলেন—“সর্বং কণিকং কণিকং, দুঃখং দুঃখং, স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং, শূন্যং শূন্যম্”। এই উক্তির ব্যাখ্যা নিয়েই চারিটি মতবাদ। বুদ্ধের এই শূন্যবাদমূলক উপদেশ যারা নির্বিবাদে স্বীকার করে নিলেন তাঁরা হলেন শূন্যবাদী মাধ্যমিক। মধ্যমশূণাক্রান্ত বলেই এঁরা মাধ্যমিক বলে পরিচিত। যোগ ও আচার উভয়টি এদের মধ্যে দেখা যায়নি, উত্তমের শূণ্য এবং অধমের দোষ এই উভয়ের সংমিশ্রণেই এঁদের মধ্যম শূণাক্রান্ত বলা হয়। যোগশব্দ এখানে ‘পর্যমুযোগ’ শব্দের একাংশরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ গুরুবাক্যে প্রসন্ন করে বিশেষ করে জ্ঞানবার ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা পর্যমুযোগ—এটি না করা অধমের কার্য, আর আচার হ'ল সদাচার, গুরুকথিত বিষয় স্বীকার করা—এটি উত্তমের ক্রিয়া,

সুতরাং উভয় ধর্মে তাঁরা মাধ্যমিক। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণ উপদেশও স্বীকার করেছিলেন, প্রসঙ্গও করেছিলেন—সবই যদি অভাবাত্মক হয়ে পড়ে তবে জগৎ অন্ধকারাত্মক হয়—তা'ত অনস্বীকার্য, তা'তে তিনি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। তারপর অত্যাশ্চর্য শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে বলেছিলেন বাহ্যার্থ ভিন্ন জ্ঞান কি করে সম্ভব? তাতে তিনি বাহ্যার্থ স্বীকার করেছিলেন। যে পর্যন্ত সূত্রের চিহ্নের অন্ত উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এজ্ঞাত অর্থাৎ সূত্রের মূল পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলে ভগবান্ এদের নৌজান্তিক আখ্যা দেন। বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে সিদ্ধ করা যেতে পারে—এরূপ উপদেশই এঁদের কাছে দান করেছিলেন। এঁরা বাহ্য বিষয় বিজ্ঞান এবং আন্তর বিজ্ঞান উভয়ই স্বীকার করেন। বৈভাবিক সংজ্ঞার কারণ হ'ল এদেরই কথিত উক্তির তাৎপর্যমূলে বিরুদ্ধতা দোষদানের নিমিত্ত। অর্থাৎ নৌজান্তিকগণের যুক্তিকে এঁরা বিভাষ বিরুদ্ধভাষ বা ভাষণ বলে দোষ দিয়ে থাকেন, তাই এঁদের নাম হ'ল বৈভাবিক। এঁরা বলে থাকেন নৌজান্তিকের মতে বাহ্যবস্তুর যে অস্বীকার গম্যতা স্বীকৃত হ'য়েছে, তা'তে অস্বীকারের ক্ষেত্রে হেতু পদার্থে ব্যাপ্তি নিশ্চয় প্রয়োজন। সেই ব্যাপ্তি নিশ্চয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রয়োজন। যেমন ধূমধারা অগ্নির অস্বীকারে প্রত্যক্ষদৃষ্ট মহানসে উভয়ের ব্যাপ্তিটি প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু নৌজান্তিকগণ প্রত্যক্ষ উদাহরণ, কিছুই উল্লেখ করেন নি। বৈভাবিকগণের মতে বাহ্যবিষয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তন্মধ্যেও প্রথমতঃ বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জনিত রূপাদিকল্পনা বর্জিত কেবল কিঞ্চৎ পদার্থ মাত্র বোধক নির্বিকল্পক জ্ঞানই প্রমাণ। পরবর্তী রূপাদি প্রকার বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত বিষয়টি রূপাদি কল্পিত বস্তুযোগে জ্ঞান বলে অপ্রমাণ।

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ করেছিলেন। তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য কর্তৃক 'অভিধর্ম' এবং তদীয় প্রধান উপস্থায়ক আনন্দ কর্তৃক 'সূত্র' আর উপালি কর্তৃক

ভগবান্ বুদ্ধ ও যশোধরা

১৭

‘বিনয়’—এই ত্রিধারায় যে অমূল্য গ্রন্থ রচিত হয় এই ‘ব্রহ্মজয়েই’ শাক্য-
 সিংহের সমুদয় বাণী গৃহীত হয়েছিল বলে বৌদ্ধদের প্রাচীন মূলগ্রন্থ ত্রিপিটক।
 এই গ্রন্থত্রয়ের অধিকাংশ বাক্যই ভগবান্ বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী বলে
 ভিক্ষুগণ গ্রহণ করেছেন; কিয়দংশ শ্রাবক-ভাষিত; কিয়দংশ ঋষি ও
 দেব ভাষিত। কথিত আছে যে ত্রিপিটকে লেখা ৮৪,০০০ শ্লোকের মধ্যে
 স্বয়ং বুদ্ধদেব ৮২,০০০ বিরাশী হাজার নিজেই বিবৃত করেছিলেন। অবশিষ্ট
 দু’হাজার অন্যান্যদের। বৌদ্ধধর্মে কোথাও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন বিচার
 উপস্থাপিত করা হয়নি। সাংখ্য মীমাংসাদিও ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন নি,
 কিন্তু বেদান্তনারী স্থির আত্মা স্বীকার করেছেন বলে তাঁদের ঈশ্বর নিরূপণে
 প্রয়াস না থাকা সত্ত্বেও মুনীনাং কপিলঃ শ্রেষ্ঠঃ বলে কপিলদেব পূজিত
 হয়েছেন। বুদ্ধদেবও বেদের মূল তত্ত্ব যা’ সকাম সাধনা থেকে নিকাম
 মার্গে পৌছান এবং মূল তত্ত্ব জ্ঞানার্থিকার, সে পরম বিজ্ঞাকে আঘাত
 করেন নি। বরঞ্চ মূল লক্ষ্য করলে সর্বত্রই একটা তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য সমন্বয়ের
 সুরাই প্রতীত হয়। ফলতঃ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কেবলাদ্বৈতের একটা নিকট
 সম্বন্ধ বিद्यমান, যার জন্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন যেমন পালি ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, তার
 থেকে অনেক অধিক পরিমাণে প্রচারিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। মহাবস্তু,
 ললিত বিস্তর, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, প্রজ্ঞাপারমিতা শূত্র. নব বিপুল্য শূত্রের অন্তর্গত
 অত্রাণ্ড গ্রন্থ, মাতৃচেত, অসঙ্গ, বহুবদ্ধু প্রভৃতি বরিস্ট গ্রন্থকারগণের গ্রন্থনিচয়,
 বৌদ্ধ তন্ত্র, বৌদ্ধস্তোত্র সাহিত্য ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খ্রীঃ তৃতীয়
 শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত-এর নিরন্তর পরিপূর্তি সাধিত
 হয়েছে। বঙ্গদেশেই কত উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত বৌদ্ধ মহাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।
 জননী লক্ষ্মীকরা, জননী চিন্তা প্রভৃতি মহীয়সী নারীরাও কত অনবচ্ছ
 দান করে গেছেন এই সাহিত্যে। বাঙ্গালী রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধ সংস্কৃত

সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য লেখক, যার কর্মপ্রচোদনা, বুদ্ধভক্তি প্রভৃতি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের সঞ্চার করে।^১

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতি ভারতীয়দের দীর্ঘকালের উপেক্ষার পরিমাণ ও ফল তখনই উপলব্ধ হয়, যখনই আমরা তুলনামূলকভাবে দেখি,—তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের কি প্রভূত পর্যালোচনা হয়েছে, এবং এই সকল মূল গ্রন্থ অবলম্বনে ঐ ঐ দেশীয় ভাষায় কত শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ভারতীয় সমাজের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

যে কোনও সমাজের অভ্যুন্নতি নির্ভর করে নারীসমাজের প্রগতি এবং শ্রমিক ও মজদুর মণ্ডলীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্বাহ এবং সকলের চিন্তাভাবনার নতন উন্নয়নের উপর। বৌদ্ধযুগের একমাত্র খেরীগাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই কত মহীয়সী জননীদেব স্বাধীন উক্তি ও চিন্তার ধারার সন্ধান পাই।^২

ভগবান্ বুদ্ধের যে অমূল্য উপদেশ—জীবের যাবতীয় কল্যাণ সাধন, সমাজের মানি দূরীকরণ এবং অহিংসা প্রেমের মন্ত্রে সর্ব বিধে পরম মৈত্রী সাধন—তা' মানুষকে অমৃতের সন্ধান দিচ্ছে।

অকোদেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে।

জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনম্॥

বৌদ্ধধর্ম মৈত্রীর ধর্ম। তাতে ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডালে বৈষম্যের কোনও প্রস্থ নেই।

(১) এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের Sanskrit Buddhism নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Vedanta Kesari, Vol. XLIII, No. 1, May, 1956, pp. 52 ff.)

(২) এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের “বৌদ্ধ নারী কবি” শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (জগজ্জ্যোতিঃ, বুদ্ধ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৫৬, পৃ: ২৫—২৭)।

(১) শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সর্বদা অন্তরে নিজের মত ভালবাসার, সে ভাবে দেখবার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

কৌশাধ্যায় একনালা গ্রামের ভূস্বামী ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজকে শ্রীবুদ্ধ বলেছিলেন—
—আমি তোমার মতই একজন কৃষক। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—কৃষকের বনদ, হান, বীজ কিছুই খার নেই, তিনি কৃষক হলেন কি করে? ভগবান্ বললেন—

“বিশ্বাস আমার বীজ।

আমার শস্ত্রের ক্ষেত্র মানব-হৃদয়।

ধর্ম মম হল, জ্ঞান বনদ আমার,

নির্বাণ আমার শস্ত্র অমর অক্ষর ॥”

অর্থাৎ তাঁতে ও কৃষকে কোনও পার্থক্য নেই।

(২) উরুবিষ বনতল ধ্বনিত করে মাহুঘের প্রতি সীমাহীন করুণায় সিদ্ধার্থ বলেছিলেন—

“ন স্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্।”

কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্ ॥

(৩) বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা—যা ব্রহ্মবিহার, সে সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন—

মাতা যথা নিষং পুত্রং আয়ুসা একপুত্ৰমহুরক্থে

এবমপি সৰ্বভূতেষু মানসংভাবে অপরিমাণং।

মেতৎ সৰ্বলোকস্থিঃ মানসংভাবে অপরিমাণং

উদ্ধং অধো চ তিরিয়ৎ অসংবাধং অবেরমসপত্তং।

তিষ্ঠৎস্বং নিসিন্ধো বা সন্না নো বা যাবতস্ বিগতমিদ্ধো

এতং সতিং অধিষ্ঠেৎ ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহ ॥

অর্থাৎ যা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমন সকল প্রাণীর প্রতি অপরিণীম দয়াভাব উৎপাদন করতে হবে। উদ্দেশ্য, অধোদিকে বা চতুর্দিকে—সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিণীম দয়াভাব জন্মাতে হবে। দাঁড়াতে, চলতে, বসতে, শয়নের সময়—যতক্ষণ না নিদ্রা আসবে, ততক্ষণ এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে—তাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

(৪) তিনি আরো বলেছিলেন—

চরখ ভিক্ষবে চারিকম্
বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকাত্মকম্পায়
অখায় সুখায় দেবমহুসনাং
দেশেখ ভিক্ষবে ধর্মম্
আদিকল্যাণং মজ্জ্বো কল্যাণং
পরিষোনানকল্যাণং ॥
সাখং সব্যঙ্গনং কেবলং পরিপুষ্ণং
পরিপুষ্ণং ব্রহ্মচরিয়ং পতানেশ ॥

এই সকল কারণে বুদ্ধদেবের জন্মকালে
দেবতারাও উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন—

“উৎপন্নো লোকপ্রজ্ঞোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।

অন্ধীভূতস্ত লোকস্ত চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ—”

ভক্তকবি জয়দেব ভগবান্ বুদ্ধের করুণাবিগলিত হৃদয়ের কথা ভেবেই উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গেয়েছেন “নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্ ॥” এবং তাঁকে নারায়ণাবতাররূপে স্বীকার করে নিয়েছেন—

“কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।”

বৌদ্ধধর্ম হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের একটা সাক্ষ্য। বুদ্ধদেব বৈদিক ধর্মালুষ্ঠানে হিংসারূপে বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করেছিলেন। অপরকে ক্রোশ

(১) রণ অর্থ মল ; কাজেই রণঞ্জহঃ অর্থাৎ মলত্যাগ নিম্নল।

দিয়ে যে স্থখ, সে স্থখে বুদ্ধদেব বিধানী ছিলেন না। ধর্মাচার সমূহের সংশোধন করাই ছিল বুদ্ধদেবের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং তা' করেই তিনি হিন্দুধর্মকেই নিখিলবিশ্বে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন, শান্তিপ্রাপ্তির পথস্বরূপে এই ধর্মকেই জগৎ স্বীকার করে নিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেই রয়েছে অন্তর্নিহিত। বৌদ্ধধর্মের ভারতবর্ষে লোপ ঘটেছে যারা বলে, তারা একান্ত ভ্রান্ত ॥

শ্রীশ্রী বুদ্ধদেবের ধর্মসংস্থাপনে যিনি মূলশক্তি, সেই যশোধরা এবং ধর্ম-সংপ্রসারণের যিনি মূল কারণ,—সেই সত্রাট অশোকের সম্পর্কে আজকের এই পুণ্যদিনে সমরভাব হেতু সামান্যত হলেও উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন।

জননী যশোধরা *

বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রসারণে সব থেকে গরিষ্ঠ স্বার্থত্যাগ যিনি বরণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন জননী যশোধরা গোপা। মহা কবি নবীনচন্দ্র তাঁর অমিতাভে বলেছেন—

* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু জননীমাধবী মাধবপ্রিয়া সাক্ষাৎকৃষ্ণভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়াকে এই বলে প্রবোধ দিয়ে গিয়েছিলেন, সন্ন্যাসের পূর্বে—

“সুদন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহি যে ইহা
বধন যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই থাকিব তোমার ঠাই
এই সত্য করিলাম দৃঢ় ॥”

জননী বিষ্ণুপ্রিয়াই গোরাঙ্গ—পুত্রার অবতারণা করেছিলেন, বৈষ্ণব ধর্মকে হৃৎপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন, জাহ্নবা, বহুধা, মীতা, হুভদ্রা দেবী প্রভৃতির মাধ্যমে নারীশক্তিকে সম্পূর্ণ জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করেছিলেন, শ্রীনিবাস প্রভু প্রভৃতিকে সম্ব্রমীকাদি দান করে নিখিল বিশ্বে আকাশে বাতাসে সর্বত্র ভক্তির অতুলনীয় সুবাসা—মহিমা সংপ্রসারিত করেছিলেন। জননী যশোধরাও সমপর্যায়ের কাজই করেছিলেন ॥

তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে আমরা বলতে বাধ্য যে জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন অনেক বেশী দুঃখের ছিল। যশোধরা শ্রীবুদ্ধের জীবদ্দশায় নথর দেহ ত্যাগ করেছিলেন; জননী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর দেহত্যাগের পর স্বর্গীয় ৫৪ বৎসর কাল দেহহাটি সংরক্ষণ পূর্বক বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন, সংঘকে পরিপুষ্ট করেছিলেন জননীর অনবন্ত স্নেহসুধা দানে। তাঁর ত্যাগের তুলনা নেই, তাঁর কর্মমহিমা অবর্ণনীয় ॥

“বনে বনে কিবা কঠোর সন্ন্যাস সাধিবেন মম স্বামী ।

বিলাস ভবনে এই বেদীমূলে সাধিব সন্ন্যাস আমি ॥

তিনি নারায়ণ তাঁহার সন্ন্যাস উদ্ধার করিতে নরে ।

আমি ক্ষুদ্র নারী আমার সন্ন্যাস তাঁহার চরণ তরে ॥”

এটি বাহ্যিক সত্য হ’তে পারে’ কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে জননী যশোধরা নিজের সর্বস্ব নির্ধিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন জগজ্জনের হিতের নিমিত্ত—“বহুজন স্বধায় বহুজনহিতায়।” শক্তির আধার হলেন তিনি, তাঁর শক্তি ব্যতীত বুদ্ধদেবের অপরিমিত শক্তি ব্যক্ত হবে কি করে ?

জন্ম জন্মান্তরের লীলাসহচরী ভগবতী যশোধরা বুদ্ধশক্তির পূর্ণ আধার— যা সর্ব শাস্ত্রে স্বীকৃত । দাহিকাশক্তি ব্যতীত অগ্নি যেমন, যশোধরা ব্যতীত বুদ্ধও তাই । “মহাবস্তু” প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকৃষ্ট তথ্য অতি স্নন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে । জননীর বিবাহ-বাসরে যেমন লাবণ্যময় বাল্যজীবন অঙ্কিত দেখতে পাই (সঙ্গে যশোধরা স্ততি দেখুন), তেমনি অভিমানিনী সহধর্মিণীর হৃদয় প্রতিক্রিয়ার একটি প্রকৃষ্ট চিত্র পাই, ভগবান্ বুদ্ধের প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর মহাকবি অশ্বঘোষের নিপুণতম চিত্রণে (বুদ্ধচরিত, অষ্টমসর্গ ৩১—৪১; ছন্দকের প্রত্নতত্ত্ব, ৪২—৪৩; যশোধরার পুনর্বিলাপ, ৬১—৭০) । যে যুক্তির অবতারণা তিনি করেছেন, তাতে কোনও ভারতীয় সন্তান জননী যশোধরার সঙ্গে ভিন্ন মত হতে পারে না ; যশোধরা বলছেন—

মধেযু বা বেদবিধানসংস্কৃতো

ন দম্পতী পশ্চতি দীক্ষিতাবুভৌ ।

সমং বুভুক্ষু পরতোহপি তৎফলং

ততোহস্ত জাতো মমি ধর্মমৎসরঃ ॥ ৬৩

*

*

*

*

ভগবান্ বুদ্ধ ও যশোধরা

২৩

ন ধ্বিয়ং স্বর্গস্থায় মে স্পৃহা

ন তজ্জনশ্চানুবতোহপি দুর্লভম্।

ন তু প্রিয়ো মামিহ বা পরত্র বা

কথং ন জহাদিতি মে মনোরথঃ ॥ ৬৬

বুদ্ধ চরিত, অষ্টম সর্গ ॥

অর্থাৎ “তিনি (বুদ্ধদেব) আজ বুঝতে চাইলেন না যে স্বামী ও স্ত্রী যজ্ঞে বা বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপে উভয়েই দীক্ষিত এবং উভয়ে পরবর্তী কালেও একই ফল লাভ করেন—আহা! আজ কেন আমার প্রতি তাঁর এই ধর্মবিরোধ ভাব জন্মালো?

স্বর্গভোগস্পৃহা আমার নেই, আর সে তো আত্মসংযমী বা দৃঢ়নংকল্পবিশিষ্ট যে কোনও লোকের পক্ষে কোন শক্ত ব্যাপারও নয়। আমার একমাত্র কামনা তিনি আমাকে এই জগতে বা পরলোকে কিছুতেই যেন ছেড়ে যেতে না পারেন অর্থাৎ জীবনে মরণে তাঁর সঙ্গ স্থখলাভই আমার একমাত্র প্রার্থনা ॥”

অল্প দিকে, তাঁর মহিমময় ব্যক্তিগতজীবনের সম্মান পাই শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের বুদ্ধপ্রাপ্তির পর স্বকীয় রাজ্য প্রত্যাগমনে স্বীয় স্থির সঙ্কল্পের পূর্ণ প্রকাশে। বুদ্ধ কপিলবাস্ততে ভিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে শুদ্ধোধন তা’তে আপত্তি করেন। কিন্তু বুদ্ধের যুক্তিতে শুদ্ধোধন হার মানলেন। অতঃপর নৃপতি বুদ্ধদেবকে নিয়ে প্রাসাদে গেলে মন্ত্রিবর্গ ও রাজপরিবারের সকলেই প্রভূত সম্মানের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু স্বপুত্রা যশোধরা এলেন না। নৃপতি যশোধরাকে আসবার অহরোধ জানালে তিনি উত্তর দিলেন—“যদি আমি শ্রদ্ধার পাত্রী হই, সিদ্ধার্থ নিজে এসে নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করবেন।” শ্রীবুদ্ধদেব আত্মীয় ও মিত্রগণের সম্ভাষণান্তে জিজ্ঞাসা করলেন—“যশোধরা কোথায়?” যশোধরার আসতে অসম্মতি

জেনে তিনি তখনি যশোধরার কক্ষে গমন করলেন; সঙ্গে গেলেন সারিপুত্র ও মোগ্গলায়ন। শিষ্যদ্বয়কে সংবোধন করে শ্রীবুদ্ধ বললেন—“বহুদিন আমার দর্শনাভাবে ইনি অতিশয় শোকাবুলা। তাঁর শোককে স্বাভাবিক গতির অল্পবর্তী হতে বাধা প্রদান করলে তাঁর অন্তঃকরণ আনন্দিমুক্ত হবে না। যদি তিনি তথাগতকে স্পর্শ করেন, তাঁকে বাধা দিও না”। যশোধরা স্বীয় কক্ষে সমাসীন; পরিধানে তাঁর সামান্য পরিচ্ছদ, কেশদাম তাঁর কর্তিত। সিদ্ধার্থের গৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জননী যশোধরা সাতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন; তিনি বুদ্ধের পাদস্পর্শ করে অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জন করতে লাগলেন। একটু পরে শুদ্ধোধনের উপস্থিতির কথা ভেবে তিনি লজ্জাঘ্রিতা হলেন এবং উত্থানপূর্বক বিনীতভাবে উপবেশন করলেন। রাজা শুদ্ধোধন পুত্রবধূর হৃৎখে অভিভূত হয়ে বললেন—“যশোধরার গভীর প্রেম অভুলনীয়; এতো ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস নয়। সাত বছর হলো সিদ্ধার্থ করেছেন গৃহত্যাগ। সিদ্ধার্থের মস্তক মুণ্ডনের সংবাদ পেয়ে তিনিও স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করলেন; সিদ্ধার্থ স্নগন্ধি দ্রব্য ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করেছেন শুনে তিনিও করেছেন ঐ সমুদয় বর্জন। স্বামীর জ্ঞায় তিনিও সামান্য মুগ্ধ পাত্র করেছেন আহার। সিদ্ধার্থের মত তিনিও উত্তম বজ্রাচ্ছাদিত আসন করেছেন পরিহার এবং অপরাপর রাজপুত্র তাঁর পাণিপ্রার্থী হলে তিনি বলেছেন—তিনি সিদ্ধার্থের; কাজেই তিনি সর্বথা ক্ষমার্য।” তখন বুদ্ধ অতি মধুরভাবে জননী যশোধরার সঙ্গে করলেন বাক্যালাপ। কথোপকথনকালে যশোধরা পূর্ব পূর্বজন্মের কত পুণ্য কথাই না বিবৃত করলেন। বুদ্ধদেব জানলেন—কে এ যশোধরা—তাঁর জন্মজন্মান্তরের সমস্ত পুণ্য, সমস্ত শক্তির মৌলিক আধার। বোধিসত্ত্ব পূর্বজন্মে যখন পূর্ণ বুদ্ধত্বের জন্ত অনির্বচনীয় সাধনা করেছিলেন, তখনও জননী যশোধরাই তো তাঁকে সেই মঙ্গলময় পথে নিরন্তর করিয়ে দিয়েছিলেন অগ্রসর। যশোধরার তখনো অত্র কোনও প্রার্থনা ছিলনা—

শুধু বুদ্ধপ্রাপ্তির জীবনেও তিনি যেন বুদ্ধের সহধর্মিণী হয়েই থাকেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র প্রার্থনা।

কপিলবস্ততে আগমনের পর সপ্তম দিবসে যশোধরা সপ্তবর্ষীয় পুত্র রাহুলকে বললেন, অদূরে দৃশ্যমান ব্রহ্মার ন্যায় গৌরবাস্থিত ঐ সন্ন্যাসী তার পিতা। এবং এও বলে দিলেন যে রাহুলের পিতা বৃহৎ চতুর্বিধ ধনভাণ্ডারের অধীশ্বর, যে ধনভাণ্ডার জননী নিজেও দেখেননি। পুত্র পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী; কাজেই রাহুল যেন তার পিতার নিকট গিয়ে সেই উত্তরাধিকারের দাবী করে। পুত্র রাহুল পিতার আহ্বারের সময় ভগবান্কে পিতৃ-সংবোধন-পূর্বক বললেন “শ্রমণ! তোমার ছায়াও পরম শুভগ্রহ।” আহ্বার সমাপ্তির পর পুত্রকে আশীর্বাদ করে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন কিন্তু পুত্র পিতার সঙ্গ ছাড়লেন না। ভগবান্ বুদ্ধ সারিপুত্তকে সংবোধন করে বললেন—“আমার পুত্র উত্তরাধিকারের প্রার্থী। যে ধন অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ’বে, সে ধন আমি তাকে দেব না; ও’তে তার কেবল উদ্বেগ ও দুঃখ হবে। আমি তাকে পবিত্র জীবনে উত্তরাধিকার দিতে সমর্থ, যা’ অক্ষয় ভাণ্ডার।” বুদ্ধ স্বীয় পুত্রকে চতুরঙ্গ সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ শিক্ষা দিলেন এবং সর্বোত্তম অবস্থা লাভের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর ভিক্ষুদের সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করলেন। জননী যশোধরার ইচ্ছাই এতদিন পূর্ণ হলো; তিনিই পুত্রকে দীক্ষার নিমিত্ত পুত্রকে নিজে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনায় বুদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোদন হলেন মর্মাহত এবং তাঁর অভিযোগে বুদ্ধদেব ও অঙ্গীকার করলেন যে তারপর থেকে কোনও অপ্রাপ্ত বয়সকে তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের অমুমতি না নিয়ে তিনি সঙ্ঘভুক্ত করবেন না। এমনি ধর্মের মূর্ত প্রতীক ছিলেন জননী যশোধরা। বুদ্ধসঙ্ঘের অন্তর্নিহিত সর্বাঙ্গীণ শক্তি জননী যশোধরা। যশোধরা শাস্ত্রীর সাহায্যে নারীদের সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত করেন ॥

সম্রাট অশোক

সম্রাট অশোক এই ধর্মকে সমস্ত পৃথিবীতে করেছিলেন প্রচারিত। তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে করেছিলেন ধর্মপ্রচার তাঁর প্রেরণায় ও আদেশে। পালি ত্রিপিটক তাঁদের মহামহিমময় প্রচারের ফলে সগৌরবে রয়েছে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত—চিরছোতনশীল।

স্বল্প সময়ে বাগ্‌ বাহুল্যের অবকাশ নেই; তবু আজ এই প্রসঙ্গে স্ফেমেজ্য বাসদাসের একটি অমিয়মাথা কবিতা নিরন্তর শ্রবণপথে উদ্ভিত হচ্ছে, এবং তাই উদ্ধৃত করছি—

“হসতি সকললোকালোকসর্গায় ভাষুঃ
পরমমমৃতবৃষ্টে পূর্ণতামেতি চন্দ্রঃ ।
ইয়তি জগতি পূজ্যং জন্ম গৃহ্নাতি কশ্চিৎ
বিপুলকুশলমেভুঃ সর্বসন্তারণায় ॥”

(অবদাস—কল্পলতা)

অর্থাৎ সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত সূর্য উদ্ভিত হন, পরম অমৃত বর্ষণ করবার জন্য চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেন; এই জগতে জীবগণের উদ্ধার সাধনের অভিপ্রায়ে পুণ্যমেতু নির্মাণ করার জন্য পুজনীয় মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন ॥

বুদ্ধদেব সমগ্র জগৎ সমুদ্ধারের জন্তই হয়েছিলেন প্রবুদ্ধ; তাঁর ধর্ম আশ্রয়প্রার্থীদের সার্থকতম বিভূতিময় বিকাশ, তাঁর সজ্জ ভক্ত শরণাগতবৃন্দের অনন্ত কল্যাণসজ্জ করে বিতরণ। আজ শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের ২৫০০তম মহাপরিনির্বাণ বৎসরে তাঁর শ্রীশ্রীচরণকমলে শতকোটি প্রণতি নিবেদন করি মহাকবি অশ্বঘোষের ভাষায়—

শ্রিয়ং পরার্থাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ

তমো নিরন্তরভিভূতভানুভূৎ ।

সুদয়িত্বাং জিতচাক্ৰচন্দ্রমা

সংবধ্যতেহহঁন্ ইহ হস্ত নোপমা ॥

অর্থাৎ যিনি পরম সম্পদ লাভ করে বিধাতাকে করেছেন জয়, সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে যিনি সূর্যকে করেছেন পরাজিত, লোকের শোক সন্তাপ নিবারণ করে যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করেছেন, বস্তুতঃ জগতে যার উপমা নেই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করি ॥

বুদ্ধবাণী

উক্তর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুর্ধুরীণ-সংগৃহীত।

(ক) ধর্মপদ ॥

- ১। অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিসং অনিসিসং,
গহকারকং গবেসন্তো হুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক, দিট্টেঠা'সি পুন গেহং ন কাহসি,
সত্তা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকুটং বিসম্বিতং,
বিসম্বারগতং চিত্তং তদ্বানং থযমজ্জাগা।

জরাবগগো, (৮—২ ১৫৩—১৫৪)

- ২। যো পাণং অতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে অদিগ্গং আদিযতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।
সুসামেরষপানঞ্চ যো নরো অহুযুজ্জতি,
ইন্দ্রেমেসো লোকস্মিং মূলংথগতি অন্তনো।
এবং ভো পুরিস, জানাহি পাপধম্মা অসঞ্জাতা,
মা তং লোভো অধম্মো চ চিরং হুক্খায় রক্ষয়্যাং।

মলবগগো, (১২—১৪, ২৪৬—২৪৮)

- ৩। নহি বেৱেন বেৱানি সম্বস্তী'ধ কুদাচনং,
অবেৱেন চ সম্বস্তি এস ধম্মো সনন্তনো। যমকবগগো (৫)

- ৪। অসারে সারমতিনো সারেচ অসারদসিস্নো,
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসক্কম গোচরা।
সারঞ্চ সারতো এত্তা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসক্কম্পগোচরা। যমকবগগো (১১, ১২)

ডক্টর চৌধুরীর ভাষণ

- ৫। অপ্পমদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং,
 অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা।
 এতং বিসেসতো ঞ্ছা অপ্পমাদম্হি পত্তিতা,
 অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা
 তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরকমা,
 কুসন্তি ধীরা নিস্সানং যোগক্কেমং অন্তরং।

অপ্পমাদবগ্গো (১—৩; ২১—২৩)

- ৬। ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
 অন্তনো'ব অবেকেখ্য কতানি অকতানি চ।

পুপ্পবগ্গো (৭, ৫০)

- ৭। পুত্তম'খি ধনম'খি ইতি বালো বিহঞ্জেতি,
 অত্তাহি অন্তনো নখি কুতো পুত্তা কুতো ধনং।

বালবগ্গো (৩, ৬২)

- ৮। ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,
 ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসত্তমে।

পত্তিতবগ্গো (৩, ৭৮)

- ৯। যো দণ্ডেন অদণ্ডেন্স অপ্পহুটেট্টেন্স কুসন্তি,
 দসন্নমঞ্জেতয়ন্তানং থিপ্পমেব নিগচ্ছতি।
 বেদনং ফক্কসং জানিং সরীরস্ চ ভেদনং
 গরুকং বাপি আবাব্বং চিত্তক্কেপং'ব পাপুণে।
 রাজতো বা উপস্সগ্গং অন্তক্খানং ব দাক্কণং
 পরিক্খয়ং ব ঞ্জাতীনং ভোগানং ব পত্তন্তরং।
 অথব'সম্ম অগারানি অগ্গিগ্গ ডহতি পাবকো;
 কামস্স ভেদা কুপ্পঞ্জে ঞ্জা নিরয়ং সোপপজ্জতি।

দণ্ডবগ্গো (৯—১২, ১৩৭, ১৪০)

- ১০। অভনা'ব কতং পাপং অভনা সঙ্কলিন্ সতি,
অভনা অকতং পাপং অভনা'ব বিশ্বজ্ঞাতি,
হৃদ্ধি অহৃদ্ধি পচত্তং নাঞেঞা অঞেঞং বিসোধয়ে।
অন্তবগ্গো (২, ১৬৫)
- ১১। কিচ্ছে। মস্ সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্ছান জীবিতং,
কিচ্ছং সন্ধস্মনবগং কিচ্ছে। বুদ্ধানং উপ্পাদো।
বুদ্ধবগ্গো (৪, ১৮২)
- ১২। সন্ধপাপস্ অকরণং কুলস্ উপসম্পদা,
সচিন্তপরিবোধপনং এতং বুদ্ধানসানং। বুদ্ধবগ্গো (৫, ১৮৩)
- ১৩। বহং বে সরণং যন্তি পস্সতানি বনানি চ,
আরামক্কথচেত্যানি মল্লগুসভয়তজ্জিতা।
নেতং ধো সরণং থেমং নেতং সরণমুত্তমং,
নেতং সরণং আগম্ম সন্ধদুখা পমুচ্চতি।
যো চ বুদ্ধক্ক ধম্মক্ক সজ্জক্ক সরণং গতো
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সন্মপ্পঞ্ঞাষ পস্সতি।
দুখং দুখসমুপ্পাদং দুখস্ চ অতিক্কমং,
অরিয়ক্কট্টজ্জিকং মগ্গং দুখুপসমগামিনং।
এতং ধো সরণং থেমং এতং সরণমুত্তমং,
এতং সরণমাগম্ম সন্ধদুখা পমুচ্চতি।
বুদ্ধবগ্গো (১০—১৪, ১৮০—১৯২)
- ১৪। চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোধিমাগতং,
ঞাতিমিত্তা হৃহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং।
তথে'ব কতপ্পঞ্ঞস্পি অস্মা লোকা পরং গতং,
প্পঞ্ঞানি পতিগগ্হন্তি পিযং এগতিং'ব আগতং।
পিয়বগ্গো (১১—১২, ২১৯—২২০)

ডক্টর চৌধুরীর ভাষণ

১৫। মগ্গানির্হট্টিকো সেট্টো সচ্চানং চতুরো পদা,
 বিরাগো সেট্টো ধম্মানং বিপদানঞ্চ চক্কুম্মা।
 এসেব মগ্গো নথ'এংঞো দম্ভসনসং বিসুদ্ধিষা,
 এতং হিং তুমহে পটিপজ্জথ মারসসেতং পমোহনং,
 এতং হি তুমহে পটিপন্ন দুক্কথসসত্তং করিস্সথ,
 অকথাতো বে ময়া মগ্গো অঞ'এয় সল্লমহনং।
 তুমহেহি কিচ্চং আতপ্পং অকথাতারো তথাগতা,
 পাটিপন্ন পমোক্কথন্তি ঝাযিনো মারবন্ধনা।

মগ্গবগ্গো (১—৪, ২৭৩—২৭৬)

১৬। মল্লজসস পমত্তচারিণো তণ্হা বড্ঢতি মান্ধা বিষ,
 নো প্রবতি হরাহরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।
 যং এসা সহতী জস্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
 সোকা তস্ পবড্ঢন্তি অভিভট্টং'ব বীরণং।
 যো চে তং সহতী জস্মিং তণ্হং লোকে দুন্নয়ং,
 সোকা তম্হা পপত্তন্তি উদবিদ্ধু'ব পোক্কথরা।
 তং বো বদামি ভঙ্কং বো যাবন্তে'থ সমাগতা,
 তণ্হায় মূলং খণথ উনীরথো'ব বীরণং
 মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভঙ্গি পুনপ্পুনং।

তন্থাবগ্গো (১—৪, ৩৩৪—৩৩৭)

১৭। চুত্তিং যো বেদি সত্তানং উপপত্তিঞ্চ সন্ধানো,
 অসত্তং স্বেগতং বুদ্ধং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং।
 যস্স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধক্কমাত্তসা,
 খীণাসবং অরহন্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

ব্রাহ্মণবগ্গো (৩৭—৩৮, ৪১৯—৪২০)

১৮। সন্ধানানং ধম্মদানং জিনাতি
 সন্ধানং রসং ধম্মরনো জিনাতি
 সন্ধানং রতিং ধম্মরতী জিনাতি
 তণ্হক্কথো সন্ধানক্কথং জিনাতি।

তণ্হাবগ্গো (২১, ৩৫৪)

(খ) মহাবগ্গো—মহাক্খন্ডকং

পঞ্চবগ্গীয় কথা

- (১) “অহং হি অরহা লোকে, অহং সখা অল্পত্তরো
 একোমিহ সন্মাসংবুদ্ধো সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো
 ধম্মচক্কং পবত্তেতুং গচ্ছামি কাসিনং পুরং
 অদ্ভুতস্মিং লোকস্মিং অহংএছুং অমতহুন্মুভিস্তি ॥”

সেইখানেই তিনি পঞ্চবগ্গীয় ভিক্ষুকে প্রথমে স্বকীয়ধর্মে করলেন দীক্ষিত—
 বললেন তাঁদের—

অথথো ভগবা পঞ্চবগ্গিগমে ভিক্ষু আমন্তেসি। ধেম্মে ভিক্ষবে অন্তা
 পরজিতেন ন সেবিতব্বা যোচাং কামেস্থ কামহুখম্মিকাহুযোগো হীনো
 গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিষো অনথসংহিতো, ...এতে তে ভিক্ষবে উভো
 অন্তে অল্পপগম্ম মজ্জিম্মা পটিপদা তথাগতেন অভিসংবুদ্ধা চক্খুকরণী
 ঞ্ণাণকরণী উপসমায় অভিঞায় সংবোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি। কতমা
 চ সা ভিক্ষবে মজ্জিম্মা পটিপদা তথাগতেন অভিসংবুদ্ধা চক্খুকরণী
 ঞ্ণাণকরণী উপসমায় অভিঞায় সংবোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি? অয়মেব
 অরিষো অট্টঠস্কিকো মগ্গো। সেয্যথীদং—সম্মাদিট্ঠি সম্মাসক্কপ্পো
 সম্মাবাচা সম্মাকস্মন্তো সম্মাজ্জীবো সম্মাবায়ামো সম্মাসতি সম্মাসমাধি।
 অয়ং থো সা ভিক্ষবে মজ্জিম্মা পটিপদা তথাগতেন অভিসংবুদ্ধা চক্খুকরণী
 ঞ্ণাণকরণী উপসমায় অভিঞায় সংবোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ॥

ইদং থো পন ভিক্ষবে দুক্খং অরিষসচ্চং, জাতিপি দুক্খা জরাপি দুক্খা
 ব্যাধিপি দুক্খা মরণস্পি দুক্খং অপ্পিষেহি সম্পযোগো দুক্খো পিষেহি
 বিপ্পযোগো দুক্খো যস্পিচ্ছং ন লভতি তস্পি দুক্খং সন্ধিন্তেন পঙ্কুপাদানকুখদ্ধা
 দুক্খা। ইদং থো পন ভিক্ষবে দুক্খসমুদয়ং অরিষসচ্চং, যাং তণহা
 পোনোভবিকা নন্দিরাগসহগতা তজ্জ তত্রাভিনন্দিনী, সেয্যথীদং—কামতণহা
 ভবতণহা বিভবতণহা। ইদং থো পন ভিক্ষবে দুক্খনিরোধং অরিষসচ্চং, যো

তস্মাৎসেব তণহাষ অসেসবিরাগনিরোধো চাপো পটিনিস্গগোমুক্তি অনালযো।
ইদং খো পন ভিক্ষবে দুঃখনিরোধগামিনী পটিপদা অরিসসচ্চং, অবমেব
অরিসো অট্টমিকো মগ্গো, সেযাখীদং—সম্মাদিট্ঠি—পে—সম্মাসমাধি।

ভগবান্ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন—“হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিত এই দুই বিষয়ের অন্ত অহুশীলন করবে না : প্রথম, কামসুখোদ্ভেকের প্রতি অহুরক্তি, যা’ হীন গ্রাম্য, ইতর সাধারণের সেব্য, অনার্যজনোচিত ও অনর্থযুক্ত; দ্বিতীয়, আত্মনিগ্রহে অহুরক্তি, যা দুঃখদায়ক, অহুংকৃষ্ট ও অনর্থযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ! এ দুই অন্তের অহুগামী না হয়ে তথাগত মধ্যম প্রতিপদ (বা মধ্যপন্থা) অভিসংবোধিজ্ঞানে করেছেন লাভ—যা’ চক্ষুরণী ও জ্ঞানকরণী এবং যা’ উপশম, অভিজ্ঞতা, সংবোধি ও নির্বাণ অভিমুখে পরিচালিত করে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই মধ্যম প্রতিপদ। অষ্টাঙ্গ যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ শ্রুতি ও সম্যক্ সমাধি। হে ভিক্ষুগণ! এটিই সেই মধ্যম প্রতিপদ যা’ তথাগত অভিসংবোধিজ্ঞানে লাভ করেছেন, যা’ চক্ষুরণী, জ্ঞানকরণী এবং যা’ উপশম, অভিজ্ঞা, সংবোধি ও নির্বাণ অভিমুখে সংবর্তিত করে।

হে ভিক্ষুগণ! জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ ও প্রিয়বিরোগ দুঃখ, ঈপ্সিতত্ববস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। এটিই দুঃখ আর্য সত্য। পুনর্ভবকারিণী, নন্দিরাগসহগতা এবং তত্র তত্র গমনাভিলাষিণী এই যে তৃষ্ণা—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা—এই দুঃখ সমুদায় আর্ষসত্য; যা’ নিঃশেষে সেই তৃষ্ণার নিরোধ, বিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জন—এবং তা’ থেকে অনালয় মুক্তি—এই দুঃখনিরোধ আর্ষসত্য। আর্যষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ আর্ষসত্য। অষ্টাঙ্গ যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ শ্রুতি ও সম্যক্ সমাধি।”

উদ্ধৃত বুদ্ধবাণীর (পৃঃ ২৭-৩০) মূলানুসন্ধান

ও

বঙ্গানুবাদ

১। অনেকজাতিসংসারং (জরাবগ্গো—৮-২, ১৫৩—১৫৪)

মূলানুসন্ধান ও অনুবাদ :—

ভগবান্ বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পর বোধিতকুম্বে আনন্দজ্ঞাপন করে ঐ গাথা উচ্চারণ করেছিলেন এবং উত্তরকালে তা শিষ্য আনন্দ স্ববিরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

আমি গৃহনির্মাতার অহুসন্ধানে জন্মজন্মান্তর সংসারে ভ্রমণ করেছি— কিন্তু দেখা মিলে নাই, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি দুঃখকর। হে গৃহকারক, এবার তোমার দেখা পেয়েছি, আর তুমি গৃহনির্মাণে সমর্থ নও। কারণ তোমার গৃহরচনার যাবতীয় উপাদান ভেঙেছে, গৃহচূড়া বিচ্ছিন্ন। এখন আমার চিন্তা সংস্কারমুক্ত (বিসংস্কারগত—সংস্কারাতীত নির্বাণগত)। তৃষ্ণাও ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়েছে।

২। যো পাণং অতিপাতেতি (মলবগ্গো—১২-১৪, ২৪৬—২৪৮)

মূলানুসন্ধান ও অনুবাদ :—

এক সময়ে শ্রাবস্তীতে পাঁচশত উপাসক জেতবনে ভগবান্ বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকে এক একটি শীল পালন করে বলে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব পঞ্চশীলের গুণ উল্লেখ করে উপযুক্ত গাথায় তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। (পঞ্চশীল—গৃহস্থ বৌদ্ধদের অবস্থা-পালনীয় ব্রতবিশেষ। প্রাণিহত্যা, চুরি, পরদারলঙ্ঘন, মিথ্যাভাষণ ও মদদ্রব্য সেবন—এই পঞ্চবিষয়ে বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ সংযম আবশ্যক।)

ও

যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে, মিথ্যাভাষণ করে, পরধন হরণ করে, পরদার অভিগমন করে এবং সুরা ও মত্তপানে আসক্ত হয়, সে এজগতে নিজেই নিজের ধ্বংসের মূল খনন করে। হে মানব! জেনে রেখো পাপনমূহ দুর্দমনীয়। স্তত্রাং এরূপ আচরণ করে। যেন লোভ আর অধর্ম চিরকালের জন্ত তোমাকে দুঃখ মগ্ন না করে।

৩। নহি বেরেন বেরানি—(যমকবগ্গো।—৫)

মূলানুসন্ধান ও অনুবাদ :—

শ্রাবস্তীর এক তরুণ যুবক মাতার আগ্রহে বিবাহ করেছিল। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভে তার কোন সন্তান উৎপন্ন হ'ল না। বংশলোপের ভয়ে সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করলো। দ্বিতীয়া পত্নী গর্ভবতী হওয়াতে বধ্যাপত্নীর খুব হিংসা হ'ল। গুপ্তভাবে ঔষধ প্রয়োগ করে সে দু'বার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করে দিল। তৃতীয়বার ঔষধ প্রয়োগের পরিণামে অগ্নসহ মাতারই মৃত্যু ঘটে। প্রথমা পত্নীর এই দুর্কর্মের কথা জ্ঞাত হয়ে যুবক পত্নীকে ভীষণ প্রহার করে এবং তা'তে পত্নীর মৃত্যু হয়। জন্মজন্মান্তর ধরে পত্নীহত্যার শক্রতা চলতে লাগল। জন্মান্তরে তাদের একজন কুলবধু এবং অপরজন বক্ষিণী হয়ে জন্মান। গৃহবধুর সন্তান জন্মালেই বক্ষিণী কৌশলে তাকে খেয়ে ফেলত। একবার গৃহবধুটি সন্তানসহ বক্ষিণী-কর্তৃক ভক্ষণের পূর্বেই বুদ্ধের শরণাপন্ন হ'ল। তখন বুদ্ধ তাদের শক্রতা নিরসনের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ গাথা বলেছিলেন।

শক্রতার দ্বারা কখনো শক্রতা দমন করা যায় না। প্রেমের দ্বারা শক্রতার শান্তি হয় তাই হল সনাতন ধর্ম।

৪। অসারে সারমতিনো—(যমকবগ্গো—১১-১২)

মূলানুসন্ধান :—

রাজগৃহের সমীপবর্তী দু'টি গ্রামের উপতিষ্য ও কোলত নামক দু'জন ব্রাহ্মণ যুবক মুমুক্শুপরায়ণ হয়ে ঋষি সঙ্ঘের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বুদ্ধবাণীর মূলানুসন্ধান ও বঙ্গানুবাদ

৩৫

কিন্তু সেখানে মুক্তির কোন সন্ধান অবগত না হ'য়ে তাঁরা গুরু-অবেষণে বহির্গত হন। এইরূপে ভ্রমণকালে এক সময়ে তাঁরা ভিক্ষাপরায়ণ অর্হৎ অসুজি স্থবিরকে দেখতে পান। তাঁর নোন্ম্য শাস্তমূর্তি দর্শনে তাঁরা পরম প্রসন্ন হন। স্থবিরের আহারকৃত্যাদির পর উপতিষ্ঠ্য তাঁর নিকট উপস্থিত হ'য়ে বুদ্ধের ধর্মমত ও সারতত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে বিশেষ অম্মরাগী হন। তখন বুদ্ধকে দেখবার জন্তে উভয়েরই একান্ত আগ্রহ হ'ল। পূর্ব গুরু ঋষি সঙ্ঘের নিকট বিদায় নিতে এসে তাঁরা গুরুকেও বুদ্ধ-দর্শনে যাওয়ার অম্মরোধ জানালেন, কিন্তু সঙ্ঘ তাতে সন্মত হ'লেন না। অবশেষে অম্মচরবর্গসহ উভয়ে রাজগৃহে বেণুবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। এই উপতিষ্ঠ্য ও কোলিত বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষু হয়ে পরবর্তী কালে সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁদের পূর্ব গুরু সঙ্ঘ বুদ্ধের নিকট আসতে অসন্মত হয়েছেন—অবগত হয়ে বুদ্ধ এই গাথা উচ্চারণ করেছিলেন।

অম্মুবাদ :—যারা অনত্যকে সত্য বলে এবং সত্যকে অসত্য বলে গ্রহণ করে তারা মিথ্যা সঙ্কল্পপরায়ণ হওয়াতে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। পরন্তু যারা সত্যকেই প্রকৃত সত্য এবং মিথ্যাকেই বস্তুতঃ মিথ্যা বলে অধিগত হতে পারেন তাঁরাই সত্যক্ সঙ্কল্পপরায়ণ হয়ে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করতে পারেন।

৫। অপ্পমদো অমতপদং (অপ্পমাদবগ্গো, ১-৩, ২১—২৩)

মূলানুসন্ধান :—

বুদ্ধ কোন সময়ে কৌশাধীর ঘোষিতারামে ছিলেন। তখন মহারাজ উদয়নের প্রথমা পত্নী রাণী শ্রামাবতী ধর্মোপদেশ শোনবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধনমীপে যেতেন। দ্বিতীয়া পত্নী রাণী মাগন্ধিয়া ছিলেন বুদ্ধবিষেব-পরায়ণা। বুদ্ধের প্রতি শ্রামাবতীর এই শ্রদ্ধা তাকে পীড়িত করতো। তিনি ঈর্ষাবশতঃ রাজার নিকট শ্রামাবতীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ

তোলেন। রাজা ক্রমশঃ মাগন্ধিয়ার হীন অভিসন্ধি বুঝতে পারেন। শ্রামাবতীর অনিষ্ট সাধনে কৃতকার্য না হয়ে, মাগন্ধিয়া অধিকতর ক্ষুব্ধ হন। অবশেষে একদিন শ্রামাবতীর প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করেন। মহারাণী শ্রামাবতী পাঁচশত সহচরী সহ সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হয়ে মাগন্ধিয়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই সংবাদ বুদ্ধের গোচরীভূত হলে তিনি ভিক্ষুদের উপদেশরূপে উপযুক্ত গাথা উচ্চারণ করেন।

অনুবাদ :—

অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ অমরত্ব লাভ করে থাকেন, আর প্রমত্ত ব্যক্তিগণ জীবিত থেকেও মৃত। অপ্রমত্ত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এ তথ্যটি বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হ'য়ে আর্ধ্যগণের (মুনিদের) পথ অন্বেষণ করে অপ্রমাদে আনন্দ লাভ করেন। এইরূপ ধ্যানশীল, অধ্যবসায়সম্পন্ন ও দৃঢ়পরাক্রমশালী ধীর ব্যক্তিগণই ভয়হীন অমৃতের নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

৬। ন পরেসং বিলোমানি (পুণ্ড্রবগ্গো—৭, ৫০)

মূলানুবাদ :—

শ্রাবস্তীর কোন ধনবতী মহিলা পাটিক নামক বুদ্ধমত—বিরোধী এক পরিব্রাজককে পুত্রবৎ পালন করতেন। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বুদ্ধের গুণাবলী শুনে মহিলা একসময়ে জেতবনে বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হয়ে ধর্মোপদেশ শোনবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিব্রাজক তাঁকে বাধা দিলেন। মহিলা পরিব্রাজকের সে নিষেধ উপেক্ষা করে ধর্মোপদেশ শোনবার জন্তে বুদ্ধকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করে এলেন। পরিব্রাজক তা'দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বুদ্ধ ও মহিলাকে নিরতিশয় কটুবাক্যে তিরস্কার করেন। মহিলা এই অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়ে অতিশয় মর্মান্বিতা হলেন। বুদ্ধ মহিলার মনোভাব উপলব্ধি করে উপদেশরূপে এই গাথা বলেছিলেন।

বুদ্ধবাণীর মূলানুসন্ধান ও বন্ধানুবাদ

৩৭

অনুবাদ :-

পরের দোষগুণ, পরের কৃত বা অকৃত কর্মের বিষয় চিন্তা না করে
(অর্থাৎ কে তিরস্কার করলে—তায় কি অত্যাচার, সে বিচার ত্যাগ করে)
নিজের কৃত বা অকৃত ভালমন্দ কার্য বিষয়েই মন দেওয়া কর্তব্য।

৭। পুত্রম'খি ধনম'খি—(বালবগ্গো—৩, ৬২)

মূলানুসন্ধান :-

শ্রাবস্তীর অধিবাসী আনন্দশ্রেষ্ঠী অতিশয় ক্লপণ ছিলেন। তিনি পুত্র
মূলশ্রীকে একরূপ উপদেশ দিতেন যে, “দেখ স্তৃপীকৃত অশ্বন ও ক্রমশঃ অল্প
অল্প ব্যবহারেও শেষ হয়ে যায়, একটু আধটু সঞ্চয়ের গুণেই বিরাট বান্ধীকল্প
তৈরী হয়, মোমাছির একটু একটু মধু আহরণে মোটাক হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি
এই সমুদয় দেখে গৃহে বাস করেন।” এই ক্লপণ যক্ষের তায় ধনরক্ষা করতেন।
এভাবে যখন দেহ দুর্বল হয়ে এল শ্রেষ্ঠী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। দেহত্যাগ
করে শ্রেষ্ঠী এক চণ্ডাল গৃহে জন্ম নিলেন। তার জন্মদিন থেকে দেশে দুর্ভিক্ষ
প্রভৃতি নানাবিধ অকল্যাণ দেখা দিল। গ্রামবাসীদের ধারণা হ'ল এই
শিশুটিই হতভাগা, এর জন্মই একরূপ অমঙ্গল দেখা দিয়েছে। মাতাপিতা
প্রতিবেশীদের ভয়ে সন্তান পরিত্যাগ করল। তখন বালক চলবার সামর্থ্য
পেয়েছে। সে ভিক্ষা করে জীবিকার সংস্থান করতে লাগল। এভাবে ভিক্ষা
করে করে সে একদিন মূলশ্রীর গৃহে এসে উপস্থিত হল। সেখানে আসামাত্র
তার পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। কিন্তু মূলশ্রীর পুত্রগণ তাকে দেখে ভীষণ কাদতে
লাগল। তখন ভৃত্যগণ অমঙ্গল আশঙ্কা করে প্রহার করে করে তাকে গৃহ
থেকে তাড়িয়ে দিল। বুদ্ধ এ সমুদয় অবগত হয়ে বালকের পূর্বজন্মের কাহিনী
বর্ণনা করে ধর্ম সন্ধান এই গাথা উচ্চারণ করেন।

অনুবাদ :- ‘আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে’ এই ভেবে নির্বোধ
স্বাস্থ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বুঝতে চেষ্টা করেনা যে, সে নিজেই ত নিজের নয়,
আবার পুত্র ধন প্রভৃতি তার নিজের হবে ?

৮। ন ভজে পাপকে মিত্রে—(পণ্ডিতবগ্গো—৩, ৭৮)

মূলানুসন্ধান :—

সিদ্ধার্থের সারথি ছন্দক ভিক্ষু হওয়ার পর অত্যন্ত অভিমানী হন। ভিক্ষু সঙ্ঘের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না হওয়াতে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—সিদ্ধার্থের গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের সময়ে শুধু তিনিই সঙ্গী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর এখন অপর লোকজন এসে কেহ প্রধান শিষ্য আর কেহ মহাশিষ্য নেজেছেন। একরূপ উপেক্ষাসূচক বাক্যে তিনি প্রায়ই শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন শ্রবিরের নিন্দা প্রকাশ করতেন। তা' শুনে বুদ্ধ তা'কে উপদেশ দান করতেন—কিন্তু কিছুতেই ছন্দকের স্বভাব পরিবর্তিত হ'লো না। এই প্রসঙ্গেই বুদ্ধ পূর্বোক্ত গাথা উচ্চারণ করেছিলেন।

অনুবাদ :—পুরুষাধম নীচ ব্যক্তির সঙ্গ করাও উচিত নয়; পাপাচারী কুমিত্রের সংসর্গও সঙ্গত নয়। কল্যাণকারী মিত্রের সাহচর্যই কাম্য, উত্তম পুরুষের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়।

৯। যো দণ্ডেন অদণ্ডেহু (দণ্ডবগ্গো—২-১২, ১৩৭—১৪০)

মূলানুসন্ধান :—

এক সময়ে মহামৌদ্গল্যায়ন শ্রবির রাজগৃহে কালশিলা পর্বতে বসবাস করেন। তখন বুদ্ধমত বিরোধী কতিপয় সন্ন্যাসী তাঁকে হত্যা করবার অভিসন্ধিতে একদল ছর্ব্বত্ত প্রেরণ করেন। ছর্ব্বত্তেরা অর্থলোভে তিনবার মৌদ্গল্যায়নের আশ্রম আক্রমণ করে। প্রথম ছর্ব্বার দিব্যশক্তির সহায়ে আকাশপথে অন্তর্হিত হয়ে মৌদ্গল্যায়ন আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি জন্নাস্তরের কর্মফল চিন্তা করে আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হন। এদিকে ছর্ব্বত্তদল আশ্রমে প্রবেশ করে শ্রবিরকে দাক্ষণ আঘাতে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। শ্রবির ভূতলশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন। ছর্ব্বত্ত দল তাঁর মৃত্যু হয়েছে ভেবে গলায়ন করে। তারপর তিনি দিব্যশক্তি আশ্রয় করে নিজের ক্ষতবিক্ষত ছিন্নদেহ নিয়ে আকাশপথে বেণুবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন।

বুদ্ধবাণীর মূলানুসন্ধান ও বদ্বানুবাদ

৩২

এবং তাঁকে প্রণতি জানিয়ে পরিনির্বাণের অন্তিমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁর কাছে ধৰ্মোপদেশ শুনে তাঁকে নির্বাণের অন্তিমতি দান করেন। তারপর তিনি কালশিলা পর্বতে এসে নির্বাণপ্রাপ্ত হন। দুর্ভিক্ষের দ্বারা প্রভুত হয়ে যৌদগল্যায়নের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সংবাদ দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়ল। মগধরাজ অজাতশত্রু এই দুঃসংবাদ শুনে বিশেষ মর্মান্বিত হ'লেন। এই মহাপুরুষের হত্যার কারণ অপরাধীদের ধরবার জন্য তিনি চর নিযুক্ত করলেন। অবিলম্বে দুহৃতকারী ধরা পড়ল, যথাযোগ্য শাস্তিরও বিধান হল এবং বিরোধী সন্ন্যাসীদের ষড়যন্ত্রও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মহাপুরুষের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে ভিক্ষুরা একসময়ে শোকার্ত হ'য়ে বেগুবনে ধর্মসভার আলোচনাপরায়ণ হলেন। তখন বুদ্ধ তাঁদের সান্নিধ্য দিয়ে এই গাথা উচ্চারণ করেছিলেন—

অনুবাদ :—যে ব্যক্তি নিরপরাধ ও নিরস্ত্র ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করে সে অল্পকাল মধ্যেই দশপ্রকার অবস্থার যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যেমন—অসহনীয় দুঃখভোগ, ক্ষতি, অঙ্গহানি, দারুণ ব্যাধি, চিত্তবিকৃতি, রাজদণ্ড, ছরপনেন্ন অপবাদ, জাতিবিয়োগ, ধনহানি অথবা অগ্নিতে তার গৃহ দগ্ধ হয় এবং সেই দুঃখীল জন মৃত্যুর পর নরক ঘোনিতে জন্মলাভ করে থাকে।

১০। অন্তনাবকতং পাপং (অন্তবগ্গো—২, ১৬৫)

মূলানুসন্ধান :—

একসময়ে শ্রাবস্তীর চুলকাল নামক এক উপাসক জেতবনে ধর্মকথা শোনবার পর অধিক রাত্রি হওয়াতে সেইখানেই রাত্রিযাপন করে প্রত্যুষে জেতবন বিহারের সমীপবর্তী কোন পুকুরে আচমনাদির জন্তে যান। তখন চৌরসম্প্রদায়ী লোকজন নির্জনে তাঁকে দেখে চোর নিশ্চয় করে প্রহার করতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে গৃহস্থঘরের কয়েকজন দাসী কলসী নিয়ে জলের জন্তে পুকুরে এসেছিল। তারা উপাসকের এই দুর্দশা দেখে

তঁার সত্যপরিচয় দিয়ে তঁাকে চরদের হাত থেকে মুক্ত করে। ভিক্ষুগণ উপাসকের এই অবস্থা বুদ্ধের গোচরীভূত করেন। বুদ্ধ তখন এই প্রসঙ্গে তাঁদের এই গাথায় উপদেশ দান করেন।

অনুবাদ :- নিজেৱ কৃত পাপেই নিজে ক্লেশভোগ করে থাকে। নিজে কোন পাপাচরণ না করলে নিজেই বিমুক্ত থাকে। শুদ্ধি আর অশুদ্ধি নিজেৱই সৃষ্টি ; অপর কেহ কখনো অপরকে বিমুক্ত করতে পারে না। অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের ফলে যে সুখ-দুঃখ তা' সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শক্তির ফল। নিজের সাধনা না থাকলে একে অপরকে কখনো বিমুক্ত করে দিতে পারে না।

১১। কিচ্ছো মসসপটিলাভো (বুদ্ধবগ্গো—৪, ১৮২)

মূলানুবাদ :-

এক সময়ে বুদ্ধ কাশীধামে সপ্তত্ৰী নামক এক বৃক্ষমূলে বসে আছেন, এমন সময়ে, 'এরকাপত্র' নামক এক নাগরাজ বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে শুনে প্রসন্ন মনে বুদ্ধের সমীপবর্তী হয়ে তঁাকে প্রণাম করেই কাঁদতে লাগলেন। বুদ্ধ তাঁর ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলেন। নাগরাজ বললেন তিনি গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধ কাশ্যপের সময়ে একজন ধ্যানী ভিক্ষু ছিলেন। একদা বস্ত্রার স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আশ্চর্য্যের জন্তে তিনি 'নলখাগড়া' গাছ আকর্ষণ করেন, কিন্তু তা' ছিড়ে যায় এবং তঁাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঐ তৃণ গাছ বিচ্ছিন্ন করবার অপরাধে তাঁর সর্পযোনিতে জন্ম হয়, বহু চেষ্টাতেও তিনি পুনরায় মনুষ্য জন্ম ফিরে পাচ্ছেন না—তাই তার রোদনের কারণ। [ইনি দিব্য নাগরাজ। দিব্য নাগরাজদের ইচ্ছানুসারে রূপধারণেব অলৌকিক শক্তি আছে, কিন্তু ঐ আত্মনির্মিত শরীরটি স্থায়ীভাবে রাখতে পারে না, স্বকীয় সর্পরূপই স্থায়ী হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে উদ্ভিদ কাটাও পাপ, এরকাপত্র ভিক্ষু অবস্থায় 'নলখাগড়া' ছিড়ে ফেলে পাপাচারী হ'য়ে পড়েন। বৌদ্ধশাস্ত্রে পাপাচরণকারী আত্মকৃতপাপ সকলের সমক্ষে

প্রকাশে ঘোষণা করলে তা' থেকে মুক্ত হয়। এরকাপত্র বস্ত্রার জলে ভেসে যাওয়াতে সে স্বযোগ পাননি তাই শাপের ফল ভুগতে হ'ল। মনের উপর এই ধর্মের অত্যন্ত প্রভাব। এজন্তে ঐ পাপের জন্তে অহুশোচনা নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তা'তে জন্মও তেমনি হয়েছে]। বুদ্ধ নাগরাজের ঐ কথা শুনে পূর্বোক্ত গাথা উচ্চারণ করেন।

অনুবাদ : মহাশয় লাভ অতি কষ্টে হয়ে থাকে অর্থাৎ দুর্লভ, (‘মচ্ছান’) মর্ত্য বা মরণশীলদের জীবন রক্ষা করা ও আবার কষ্টসাধ্য, সঙ্কল্প-শ্রবণ অতি দুর্লভ ব্যাপার আর বুদ্ধদের আবির্ভাব ও দুর্লভ!

১২। সৰ্ব পাপসু অকরণং (বুদ্ধবঙ্গগো—৫, ১৮৩)

মূলানুসন্ধান :—

জৈতবনে আনন্দ স্থবির একদিন বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবন, আপনি অতীতের সপ্তবুদ্ধের মাতা-পিতা, আয়ু, বোধিতরু, শিষ্য-সংবাদাদি সমুদয় বৃত্তান্তই আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তাঁদের ‘উপোসথ’ সম্বন্ধে— [অর্থাৎ উপোসথ নামক ব্রত—পূর্ণিমা ও অমাবস্তায় সকল ভিক্ষু একত্র মিলিত হয়ে ভিক্ষুদের নিয়মাবলী পাঠ প্রভৃতি] কিছুই প্রকাশ করেননি। স্মরণে জানতে ইচ্ছা হয়—আপনি যে নিয়মাবলী ভিক্ষুদের জন্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাঁরাও কি অতীতের নির্দেশই দিয়ে গেছেন? তখন বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরের নিকট পূর্বোক্ত গাথায় সকল বুদ্ধগণের শিক্ষানীতি ব্যক্ত করতে থাকেন। উপর্যুক্ত গাথাটি সমুদয় উপদেশের একাংশ।

অনুবাদ : সমুদয় পাপ কার্যের অকরণ, পুণ্যের সংপ্রাপ্তি এবং আপন চিন্তের পবিত্রতা সাধন—এসব বুদ্ধদের অহুশাসন বা শিক্ষানীতি।.....

১৩। বহংবে সরণং যন্তি (বুদ্ধবঙ্গগো—১০-১৪, ১৮৮-১৯২)

মূলানুসন্ধান :

কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত ব্রাহ্মণ অগ্নিদত্ত বুদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে অপরিমিত সম্মান ও যশের অধিকারী হন। তাঁর

বহু শিষ্য ছিল, তিনি ভক্তগণকে বন জঙ্গল, আরাম চৈত্য বৃক্ষ প্রভৃতির পূজায় মুক্তি পাওয়া যায় বলে উপদেশ দান করতেন। একদিন বুদ্ধ অগ্নিদত্তের অর্হিব্যাপ্তির কারণ বিচ্যমান দেখে জেতবন থেকে তাঁর আশ্রমে পদার্পণ করে তাঁকে ধর্মোপদেশে বিমুক্ত করে পূর্বোক্ত গাথা উচ্চারণ করেছিলেন।—

অনুবাদ : মানুষ ভীতভ্রান্ত হয়ে পর্বত, বন, আরাম বৃক্ষ ও চৈত্য প্রভৃতি নানাপ্রকার আশ্রয়ই গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এই সমুদয় আশ্রয়ের কোনটিই নিরাপদ নয়, উত্তম শরণও নয়, এতাদৃশ শরণে সর্বদুঃখ থেকে প্রমুক্তি হয় না। যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করেন এবং দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখোপশমের উপায়রূপে আর্হ-অষ্টাঙ্গিকমার্গ—এই চতুর্থা সত্য সম্যক্ জ্ঞানে নিরীক্ষণ করেন, তাঁর এক্ষপ শরণই নিরাপদ ও উত্তমশরণ। এইপ্রকার শরণের ফলেই সর্বদুঃখ থেকে বিমুক্তি সম্ভব হয়ে থাকে।

১৪। চিরপ্ৰবাসিং পুরিসং (পিয়বগ্গো—১১-১২, ২১৯-২২০)

মূলানুসন্ধান :—

বারাণসীর ভক্তিমান সাধক নন্দ ঋষিপুত্রনে বুদ্ধকে একখানি সুন্দর বিহার দান করেন। সেই দানের ফলে স্বর্গে তাঁর জন্ত একখানি সুন্দর বিমান উৎপন্ন হ'ল—বিমানে ছিল নন্দের জন্ত অপেক্ষমাণ অঙ্গরাগণ। মহামৌদগল্যানন একদিন স্বর্গদর্শনে গিয়ে স্বয়ং তা' দেখে আনেন এবং বুদ্ধকে এনংবাদ দান করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ পূর্বোক্ত গাথা উচ্চারণ করেন।

অনুবাদ : দীর্ঘপ্রবাসী ব্যক্তি স্বস্থিতে গৃহপ্রত্যাগত হলে তাঁর জাতি-মিত্র-স্বহৃদ জন যেমন তাঁকে অভিনন্দিত করে থাকে তেমনি কৃত পুণ্যরাশিও ইহলোক থেকে পরলোকগত ব্যক্তিকে সাদরে প্রতিগ্রহণ বা বরণ করে নেয়।

* অষ্টাঙ্গিকমার্গ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মাস্ত, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি।

বুদ্ধবাণীর মূলানুসন্ধান ও বঙ্গানুবাদ

৪৩

১৫। মগ্গানুট্টরান্নিকো সেনটৌ (মগ্গবগ্গো ১-৪, ২৭৩-২৭৬)

মূলানুসন্ধান :—

এক সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নানাজনপদ পরিভ্রমণ করে আবার জেতবনে ফিরে আসেন। একদিন বুদ্ধের সঙ্গে ভ্রমণকারী ভিক্ষুগণ অতিথি গৃহে বসে তাদের ভ্রমণপথের দুর্গমতা ও সুগমতা নিয়ে আলোচনা করেন। বুদ্ধ তাঁদের অর্হত্বপ্রাপ্তির গুণ বিজ্ঞান দেখে ভিন্নবিষয়ে মনঃসংযোগ বারণপূর্বক প্রকৃত পথের সন্ধান জানিয়ে অধ্যাত্মপথের চিন্তায় মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেন। সেই প্রসঙ্গেই পূর্বোক্ত গাথা উচ্চারণ করেছিলেন।

অনুবাদ :—মার্গসমূহের মধ্যে (মার্গ-পথ=মুক্তিপথ) আঠার অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ [সন্ম্যক্‌দৃষ্টি, সন্ম্যক্‌সঙ্কল্প, সন্ম্যক্‌বাক্য, সন্ম্যক্‌কর্মান্ত, সন্ম্যক্‌-জীবিকা, সন্ম্যক্‌উত্তম, সন্ম্যক্‌স্বতি, সন্ম্যক্‌সমাধি]। সত্য সমূহের মধ্যে চতুরার্য সত্য শ্রেষ্ঠ [দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়]। ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগ শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদদের অর্থাৎ মহুষ্যের মধ্যে চক্ষুমান (বুদ্ধ বা তথাগত) শ্রেষ্ঠ। তা'ই হ'ল একমাত্র পথ। বিশুদ্ধির দর্শনের অস্ত্র কোন পথ নেই। এ গুলিই তোমরা অনুসরণ কর। তাই মারের গতিরোধ করতে সমর্থ [মার-পঞ্চমার-স্বদ্ধ, যুত্যা, ক্লেশ, দেবপুত্র ও অভিসংস্কার]। এদের অনুসরণে তোমরা দুঃখনাশ করতে সমর্থ হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতাবারা জেনেছি রাগাদিশাল্যের উৎপাতনকারী এগুলি,—তা'ই বলছি, তোমাদের চেষ্টা করতে হবে, তথাগতগণ ত প্রদর্শক মাত্র। এ পথের অনুসন্ধানকারী ধ্যানপরায়ণ উপাসকগণ মারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

১৬। মহুজ্জস পমত্তচারিণো (তণ্‌হাবগ্গো—১-৪, ৩৩৪—৩৩৭)

মূলানুসন্ধান :—

রাজা প্রসেনজিৎ সমীপে স্ববর্ণকাস্তি ও দুর্গন্ধমুখ একটি মংস্ত্র আনীত হ'ল। রাজা তা' নিয়ে জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন।

বুদ্ধ মংস্তের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করে রাজাকে বললেন—এই মংস্ত কাশ্যপবুদ্ধের সময়ে কপিল নামক স্থপণ্ডিত ভিক্ষু ছিল। সেই ভিক্ষু অত্যন্ত অভিমানী ছিল, সকলকে তুচ্ছজ্ঞানে কর্কশবাক্য প্রয়োগ করতে দ্বিধা করতো না এবং যথাধর্ম চলতো না। অবশেষে নরকযজ্ঞণা ভোগ করে এখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ সমাগত ব্যক্তিদের মনোভাব উপলব্ধি করে উপর্যুক্ত গাথা উচ্চারণ করেন।

অমুবাদঃ—প্রমাদপ্রবণ মাহুঘের তৃষ্ণা মালুবা লতার আয় ক্রমশঃ বেড়েই চলে। বনে ফলাভিলাষী বানরের আয় সে জগজ্জন্মান্তর ভ্রমণ করে। এই বিবাহিকা তৃষ্ণা জগতে যাকে পরাজিত করে তার শোক-সমূহ বর্জনশীল বীরগত্গতুল্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যিনি এই বিবর্দ্ধমান দুর্ভিতক্রম্য তৃষ্ণাকে পরাজিত করতে পারেন তার শোকসমূহও পদপদ্মের জলবিন্দুর আয় উৎপত্তি হয়ে যায়। সে জন্তে এইসব সমাগত ব্যক্তিদের মঙ্গলের জন্তে বলছি, উশীর মূল্যবোধী ব্যক্তির বীরগত্গতের মূলধনের আয় তৃষ্ণার মূল উৎপাটন কর। স্রোতোমুখে পতিত নলের আয় মার যেন তোমাদের পুনঃপুনঃ ধ্বংস সাধন না করে।

১৭। চুক্তিং যো বেদি সন্তানং (ব্রাহ্মণ বগ্গো—১৭-১৮, ৪১২-৪২০)

মূলানুসন্ধানঃ—

রাজগৃহের ব্রাহ্মণ 'বঙ্গীশ' মৃতব্যক্তির মস্তক দর্শনেই তার স্বর্গে বা নরকে কোথায় পুনর্জন্ম হ'তে পারে তা'বলে দিতে পারতেন। এই বিজ্ঞাসিদ্ধির সহায়ে তিনি অর্থোপার্জন করে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে অনেক গ্রাম-নগর পরিভ্রমণ করে তিনি শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে বুদ্ধের গুণমহিমা শুনে ব্রাহ্মণ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। বুদ্ধসমীপে তাঁর ধর্মকথা শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ ভিক্ষু হ'য়ে গেলেন এবং সর্বকর্ম ত্যাগ করে ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন হলেন। তাঁর পিতা তাঁকে সংসারে ফিরাবার চেষ্টা করলে পুত্র জবাব দিলেন তিনি সংসার-বিমুখ, আর ফিরবেন না।

বুদ্ধবাণীর মূলানুসন্ধান ও বঙ্গানুবাদ

৪৫

ভিক্ষুরা বঙ্গীশের এতাদৃশ বৈরাগ্য বিশ্বাস না করে তা' কপটতা বলেই বুঝে নিল, এবং ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এ সংবাদ বুদ্ধের গোচরীভূত করে দিল। বুদ্ধ বঙ্গীশ স্ববিদের অর্হৎ লাভের ঘোষণা করে ভিক্ষুদের সম্মুখে ঐ গাথা উচ্চারণ করেন।

অনুবাদ :- যিনি প্রাণগণের চ্যুতি (বিনাশ) ও উৎপত্তি (জন্ম) সর্বপ্রকারে পরিজ্ঞাত আছেন, অনাসক্ত এবং স্বগত ও বুদ্ধ হ'য়েছেন তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। যার গতিক্রম দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণ কেউ জানিতে পারেন না সেই ক্ষীণাশ্রব অর্হৎকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৮। সন্নদানং ধম্মদানং জিনাতি (তণ্হাবগ্গো—২১, ৩৫৪)

মূলানুসন্ধান :-

একসময়ে সপার্বদ দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হ'য়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান কি হ'তে পারে, তা' জানতে চান। বুদ্ধ পূর্বোক্ত গাথা উচ্চারণ করে দেবরাজকে তৃপ্ত করেন।

অনুবাদ :- ধর্মদান সকল দানকে পরাভূত করে, ধর্মরস সকল রসকে পরাজিত করে, ধর্মরতি সকল রতিকে জয় করে, তৃষ্ণাক্ষয় সর্বত্রঃথকে পরাভূত করে।

— — —

গৌতমের সাধনা ও আয়রা

ধর্মের যখন বিকৃতি উপস্থিত হয় তখন ভগবানের আবির্ভাব অবশ্যস্বাভাবিক। এই ভগবদ্ভক্তিতে সরল মনে বিশ্বাস স্থাপন না করেও ইতিহাসের প্রতি নজর রেখে একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়—পৃথিবীতে যখন কোনরূপে ধর্মের বিকৃতি উপস্থিত হ'য়েছে, তখন একজন লোকোত্তর পুরুষ আবির্ভূত হ'য়ে মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে গেছেন। জগৎটিও এমন বিচিত্র উপাদানে তৈরী যে কিছুতেই চিরকাল তা' বাঁধাধরা এক অবস্থায় অবিচল থাকে না, নিয়তই বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছে, “নাপরিণম্য ক্ষণমপি তিষ্ঠতি”,—এই পরিবর্তনের রীতিতে মাঝে মাঝে ভাঙন বা ধর্মের বিকৃতি ও ঘটে থাকে।

প্রায় আড়াইহাজার বৎসর পূর্বে এমন একটি সময় এসেছিল, যখন তপোধন ব্রহ্মদশী ঋষিদের বিশ্বকল্যাণকর প্রজ্ঞার আদর্শ মানুষের মন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ধর্মের জগতে আত্মশুদ্ধির পরিবর্তে বাহ্য-আড়ম্বর, বহুল পণ্ডিত—প্রধান যাগযজ্ঞাদিই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, শুধু তাই নয়, চিত্তশুদ্ধির অভাবে অনিবার্য পরিণামরূপে নৈতিক অবনতি উৎকর্ষরূপে দেখা দিয়েছিল, যার জগ্রে মানুষের কাছে মানুষের অপমান লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। প্রবলের দৌরাণ্ড্যে মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হয়েছিল তার ফলে দুর্বল মানব সর্বদাই তার শ্রাস্য অধিকারে ছিল বঞ্চিত। দম্ভ্য তপস্বীর রাজশাসনকেও উপেক্ষা করে হিংসার তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল। নৃশংস অশ্লীলমাল প্রভৃতি তার প্রমাণ। এই সঙ্কট সময়ে সিদ্ধার্থ গৌতমের মহাবির্ভাব। সহজাত করুণা নিয়েই জন্মেছিলেন এই বিপ্লবী ‘সদয়হৃদয়’ মহাপুরুষ। সমাজের সর্বস্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছিলেন তিনি কেবলই দুঃখ—জীবনে স্মৃতি বলতে বস্তুতঃ

গৌতমের সাধনা ও আমরা

৪৭

নেই, হৃৎসাগরে জীবকুল নিমগ্ন—হৃৎথকে বুঝতেও অক্ষম,—বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সকলে পূর্বচলিত অহুশাসনের প্রতি নির্বিচার বিশ্বাসে নির্ভর করে জীবনপাত করছে—কোথায় তাদের গতির বিরাম, কিবা পরিণাম, তার সন্ধানও রাখে না। জন্ম আর মৃত্যু—জন্ম আর মৃত্যু—এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের যেন উপায়ই নেই।

ধ্যানস্থ হয়ে গৌতম ভাবতেন—ওঃ জীবলোকের কি কষ্ট—কি বেদনা! এই জরা-ব্যাধির অন্ত কি নেই—এ থেকে মুক্তিলাভের পথ কি কিছু নেই! গভীর চিন্তার পর তাঁর মনে এল “জরামরণং কিংমূলকং”—জরামরণ কেন আসে?—এ জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর পেলেন—“জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং” জাতিসত্তা বা জীবনধারণই জরামরণের কারণ। তাঁর হেতু কি? উত্তর পেলেন,—“জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া”—উৎপত্তিই জাতির মূল। এ ভাবে মূলজিজ্ঞাসার অহুসন্ধানে জীবনের সমুদয় রহস্য তিনি অবগত হলেন, উৎপত্তির মূল উপাদান অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ধাতু, তন্মূল তৃষ্ণা, তন্মূল বেদনা, তন্মূল স্পর্শ, তন্মূল ষড়ায়তন, তন্মূল নামরূপ, তন্মূল বিজ্ঞান, তন্মূল সংস্কার ও তন্মূল অবিজ্ঞা। এই হ’ল বুদ্ধের স্বকীয় দর্শন।

এই তত্ত্ব অবগত হ’য়ে বুদ্ধ তার মূলোচ্ছেদের জন্ত উন্নতপ্রায় হলেন। এই উন্নাদনাই তাঁকে গৃহছাড়া করেছিল; গৃহ ছেড়ে তিনি বেদ-উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব সমুদয় আয়ত্ত করেও আপন জিজ্ঞাসার সমাধানে সম্যক জ্ঞানের সন্ধান পেলেন না। আড়াড় নামক এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট দীর্ঘকাল যোগসাধন প্রণালী অধিগত করেও কোন তত্ত্ব অবগত হলেন না। কৃচ্ছ্র সাধনার ব্রতী হ’য়েও তার রহস্যভেদ করতে সক্ষম হলেন না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তপস্তায় নিমগ্ন হলেন—“ভবেয়ং কল্পবৃক্ষশ্চ কালধেহুশ্চ দেহিনাম্”—এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। দীর্ঘ ছ’বৎসর তপস্তার পর চরম জ্ঞানের সাক্ষাৎলাভ করে গৌতম হয়েছিলেন সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধ।

এই যোগসিদ্ধির অভিব্যক্তি হৃন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে একটি গাথায়—

“অনেকজাতিসংসারং সদ্ধাবিসং অনিষ্কিং।

গৃহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনপ্ পুনং।”

গৃহ নির্মাতার সদ্ধানে অনেক জন্ম জন্মান্তর ঘুরেছি, পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ কি দুঃখকর। কিন্তু হে গৃহকারক, এবার তোমার সদ্ধান পেয়ে গেছি, তোমার সকল উপাদান নষ্ট করে দিয়েছি, গৃহ নির্মাণে তুমি এখন অক্ষম।

বুদ্ধের এই যে প্রক্রিয়া—প্রকৃত সত্যলভের জন্তে কঠোর তপস্বী—এতে দেখা গেল গুরু শরণভিক্ষা বা ঈশ্বরের অল্পগ্রহ সাপেক্ষতা বর্জিত হয়েছে, অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে জীব নিজেই নিজের মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে সমর্থ, এ অভিনব তত্ত্বটিই প্রকাশিত হ’য়েছে।

অলৌকিকবাদ অথবা অন্তরের বিশ্বাসমাত্রকে আশ্রয় না করে আত্ম-বিশ্লেষণের পথে মনস্তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনের দ্বারা নিজের প্রকৃত পরিচয় অধিগত করে জ্ঞান সাধনায় মাহুষ জরামৃত্যু অতিক্রম করতে পারে—এই হ’ল বুদ্ধের শিক্ষা। তাই তিনি বলেছিলেন, সর্বমানবের জন্তে যে ধর্ম, তাকে বাস্তব জীবনে পরীক্ষা না করে কেবলমাত্র স্বীকৃতিদানের দ্বারা লাভ করা যায় না। তাঁর আহ্বান তাই ছিল “এহি পস্মি কো ধম্মো”—এস প্রত্যক্ষ করে নাও ধর্মকে। এই পরীক্ষার আহ্বান এ ভাবে বুদ্ধই প্রথম জানিয়েছিলেন। বলা হয় ঈশ্বরানুগত ধর্মসমাজে এ একটা বিরাট বিদ্রোহ এবং যুগান্তকারী বিপ্লব। বুদ্ধ ধর্মজগতে বিপ্লব এনেছিলেন খুব সত্য কথা কিন্তু ঈশ্বরসত্তার অস্বীকৃতিই যদি আর্ধ্য-সভ্যতায় বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে তবে সাংখ্য মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন আদরণীয় কেন? এজন্ত মনে হয় বর্ণাশ্রম-ধর্মোচিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের এতই প্রাধান্য ছিল যে তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ব্যক্তিমাত্রই দণ্ডাই বলে গণ্য হ’ত। অথচ গণমানসে বুদ্ধের অভিধান অভিনন্দিত হ’ল। বুদ্ধদেব অগণিত লোকসমাজের হৃদয় জয় করেছিলেন আপন ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে, তাঁর বিশ্বজয়ী করুণাবর্ষণে।

গৌতমের সাধনা ও আমরা

৪২

পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতিতে পরম্পরের সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচিত হয়েছিল, কৃত্রিম ভেদ মানুষকে মর্যাদাহীন করে তুলেছিল, এ ক্রটি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। বুদ্ধদেব সকলকে সমানভাবে আহ্বান করলেন তাঁর ছত্রচ্ছায়াতলে; তাঁর মতে যে কেহ এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে হৃৎকম্পের অমোঘ অস্ত্র নির্বাণলাভের অধিকারী হ'তে পারে। নির্বাণই তাঁর মতে একমাত্র সত্য ও লক্ষ্য, জীবন হৃৎকম্প। অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের সাধনায় প্রবৃত্ত হ'লে এই পরমতত্ত্বলাভ সম্ভব। বুদ্ধ প্রবর্তিত এই ধর্ম যে মনোবিজ্ঞান সম্ভূত অর্থাৎ মনের শক্তির উপর তা' নির্ভর করে, ধর্মপদের প্রথম দু'টি গাথায় তা স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হ'য়েছে—

মনোপুঙ্কজমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,

মনসা চে পহুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,

ততো নং হৃৎকম্পয়েতি চক্কং'ব বহতো পদং । (১)

মনোপুঙ্কজমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,

মনসা চে পনগ্গেন ভাসতি বা করোতি বা,

ততো নং সুখময়েতি ছান্না'ব অনপায়িনী । (২)

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ দু'টির ব্যাখ্যা হ'ল—

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জন্ম হ'ল মনে,

দৃষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিংবা কথা ভণে।

হৃৎকম্প তার পিছে ধায় চক্ৰ যথা গোল্লর পিছনে । (১)

মন আগে ধর্ম পিছে ধর্মের জন্ম হ'ল মনে,

যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিংবা কথা ভণে,

সুখ তার পিছে ফিরে ছান্না যথা কান্নার পিছনে । (২)

বৌদ্ধশাস্ত্রে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে গুণের অধিকারী সেই বোধিসত্ত্ব;— “যথা কৃত্যাদেবী বাক্যং—,

লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেবলম্ ।

যে জন্তুবো, গতক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানবেহি তান্ ।

সাগসেপি ন কুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্বন্তি ।

বোধিং স্বশ্চেব নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধারণোত্তমাঃ ॥”

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ থেকে আরম্ভ করে যে সকল জীব গতক্লেশ হয়েছেন তাদের সকলকেই তুমি বোধিসত্ত্ব বলে জান। অপরাধ সত্ত্বেও যারা কোপ করেন না, অথচ ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অপরকে গতক্লেশ করবার ইচ্ছা করেন তাঁরাই বোধিসত্ত্ব এবং বিশ্বধারণে উত্তম।” তাঁরা বলেন জীবমাত্রেরই এই নির্বাণলাভের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকৃতি রয়েছে। আপাততঃ বৈষয়িক স্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবের মধ্যে আনন্দ প্রত্যক্ষীভূত হ’লে ও প্রকৃতপক্ষে তা সূখ বা আনন্দ নয়, দুঃখেরই নামান্তর, অথবা কিছুদিন গত হ’লে সেই অবস্থাটিও জীবের রুচিগ্রন্থ মনে হয় না কেন? আবার নূতন কিছুর সন্ধানে জীব যত্নপর হয় কেন? তাই বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হ’য়েছে এই সমুদয় বিষয়জ্ঞ সূখ ও সাময়িক বিড়ম্বনার পরিচয়, আসলে স্বাভাবিক নির্মল অবস্থাটি হারিয়ে যাওয়াতেই জীবের এ চাঞ্চল্য। একটি স্তম্ভর দৃষ্টান্তে তা ব্যক্ত করা হ’য়েছে—

“বারিজো’ব থলে থিত্তো ওকমোকত উত্ততো ।

পরিপ্ফন্দতি’দং চিত্তং মারথেষ্যং পহাতবে ॥” (ধম্মপদ ৩৪)

অর্থাৎ “মাছ যেমন জল থেকে স্থলে নিক্ষিপ্ত হ’লে মৃত্যুভয়ে স্বস্থানে ফিরে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে, আমাদের চিত্তও তেমনি স্বাভাবিক নির্মল অবস্থা থেকে উঠে এসে অস্বাভাবিক পরিবেশে পড়ে চঞ্চল হয়ে ছট্‌ফট্‌ করে স্বাভাবিক পূর্বাবস্থাটি ফিরে পাবার জন্যে।” স্তম্ভরাং চিত্তের যখন

চঞ্চলাবস্থা তখন বুঝতে হ'বে চিত্ত এক অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়েছে, তা' থেকে বিমুক্তিলাভের জন্তে তার এ ব্যগ্রতা।

বুদ্ধের বাণী তাই পৌরুষ ও আত্মবিশ্বাসের বাণী, নিজেরই শক্তিতে নির্ভর করে নিজের মুক্তি সাধনের অমৃতময় উপদেশ, নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্তে দীপ্ত নির্দোষ। এ ভাবে মূল সত্যকে সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন তিনি অকপট উপলব্ধির মাধ্যমে। বাসনা বা আসক্তি প্রভৃতিকে নির্বাণের অন্তরায় বলে গণ্য করা হয়, এগুলো থাকতে পূজা, ধ্যান ধারণা—নব নিষ্ফল, আর্ষদের সে ঈশ্বর বিশ্বাসও কোথায় ভেসে যায়—স্বীকৃতি মাত্রই সার হয়ে উঠে; উপলব্ধির পক্ষে, প্রাপ্তির পক্ষে তা' মূল্যহীন, তাই তাঁর তত্ত্ব বিচারের সঙ্কেত—

“নখি রাগসমো অগ্গি নখি দোসসমো গহো।

নখি মোহসমং জালং নখি তণ্হা সমা নদী।” ধর্মপদ, ২৫১

“রাগ বা আসক্তির তুল্য অগ্নি নেই, ঘেব তুল্য গ্রহ নেই, মোহ তুল্য পাপ নেই আর তৃষ্ণার তুল্য নদী নেই।” এ ভাবে প্রতিক্ষেত্রে দোষ গুণ বিচার করে অগ্রসর হ'বার নীতিই বৌদ্ধ শাস্ত্রে নির্বাণ লাভের অবলম্বনীয় পথ বলে স্বীকৃত হ'য়েছে। তার উপায়রূপে সকলের জন্তেই চতুরার্য সত্য এবং শীলানুসরণের আবশ্যকতা বর্ণিত হ'য়েছে। এর চরম ফল নির্বাণাখ্য পরম স্ত্রুথ—“নিকানং পরমং স্ত্রুথং”।

যাঁরা ঈশ্বরসাধনায় অগ্রসর হ'য়ে পরমপদ লাভের প্রয়াসী, তাঁরাও পরম স্ত্রুথেরই অভিলাষী। যাঁরা উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমায় পরম পদানুসন্ধানী তাঁরাও ঐ পরম স্ত্রুথেরই অভিলাষ পোষণ করেন। উপনিষদ আত্মার ভূমা এবং ভূমারই জিজ্ঞাস্তৃত্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা স্ত্রুথেরই লক্ষ্যতা প্রকাশ করেছেন—ভূমা স্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমৈব স্ত্রুথং নাম্নে স্ত্রুথমন্তি। এখানে একটি কথা প্রশ্নবিধানযোগ্য যে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রেমস্পর্শ অনুভবে না পেলে দিনের পর দিন কেবলমাত্র বিশ্বাস পোষণ

করে নিজেকে অবিচল রেখে অগ্রসর হওয়া অসাধ্য ব্যাপার, দীর্ঘকাল সে অথও বিধান রক্ষা করাও কঠিন, সে উচ্চাধিকার, ঈশ্বর প্রেমের সে দেব দুর্লভ সম্পদ অনধিকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা করা কি স্বাভাবিক? ছ'একটি অতিমানবের দৃষ্টান্তমাত্র দিয়ে কোটি কোটি মানবের মনের পরিবর্তন সাধন, প্রত্যেকের মনস্তলে সে উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন সহজসাধ্য নয়। বুদ্ধ এ সম্বন্ধে তাই নীরব। বিরোধিতাও দেখান নি আলোকুল্যও করেন নি। তাঁর প্রক্ৰিয়া তাই ভিন্নমুখী। আত্ম-বিশ্লেষণের পথে প্রত্যেকের হাতে তিনি নিজ নিজ অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। অথচ বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সম্বন্ধে এভাবে নীরব বলেই অভিযোগ উঠেছে তাঁর প্রতি। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে একথা বলা কি অসম্ভব হবে যে স্বয়ং ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে এবং পতঞ্জলি যোগসূত্রে গোঁপক্ষেই ঈশ্বরারাদনাদির কথা বলেছেন।—“অপি সংরাধনে চ” এবং “ঈশ্বর-প্রাণিদানাদা” প্রভৃতি সূত্র ‘চ’ ‘বা’—প্রভৃতির দ্বারা পক্ষান্তরই সূচনা করে। কারণ যোগী পতঞ্জলি এবং জ্ঞানী ব্যাসদেব ও আত্মবিশ্লেষণের পথেই অগ্রসর হ'য়েছেন।

তত্ত্বিগ্ন বৌদ্ধশাস্ত্রের “মনোপুস্কঙ্গমা” প্রভৃতি মনস্তত্ত্বের মূলনীতি যে একেবারে আর্ধ্যশাস্ত্রের ছায়াতিজ্জ্বল একথা জোর করে বলা চলে না। উপনিষদ বলেছেন ব্রহ্মকে মন দিয়েই জানতে হয়—“মনসৈবাত্মদ্রষ্টব্যম্”। তা' অবশ্যই শ্রবণমননাদি দ্বারা সংস্কৃত হওয়া চাই। বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে সকলেই এই পরমপদের সমান অধিকারী একথা বলা হয়েছে। আর্ধ্যশাস্ত্রও তার-স্বরে একথা ঘোষণা করেছে—“জিয়ো বৈশ্বাস্তথাশূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্”। গুণের উৎকর্ষ শুধু বৌদ্ধ সম্মতই নয়। আর্ধ্যশাস্ত্র একথা একান্ত নির্ভরতার সঙ্গেই বলেছে—“চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ”। পূর্বাচার্যদের অল্পস্বত কৃচ্ছ্রসাধন-পন্থা পরিত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্তও বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এ সম্বন্ধে কি স্মরণ করে বলা হয়েছে কুছ সাধনের নিন্দা করে—“কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাঠৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্থরনিশ্চয়ান্॥” (১৭.৬)

“দ্বারা এভাবে অতি কষ্টসাধ্য সাধনার দ্বারা আমাকে পেতে চায়, তাঁরা নিজেরাও কষ্ট পায়। অন্তর্যামী আমাকেও কষ্ট দেয়,—এদের অস্থরভাবপর বলে জানবে।’ এইভাবে অর্থা উপনিষদের সার সত্যগুলি বিঘোষিত করেও বুদ্ধদেব ধর্মজগতে যাগযজ্ঞাদির নিন্দা দ্বারা এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করেছিলেন। বিপ্লব মাত্রই দোষাবহ নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনে ইন্দ্রপূজার বিঘ্ন ঘটিয়ে তখনকার সমাজ চেতনায় বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। যার পরিণামে তাঁকে গোবর্দ্ধন ধারণ করতে হ’ল। কিন্তু তা’ ছিল সর্বকল্যাণকর এইজন্য যে, ভগবানের প্রতি সকলকে একচিত্ত ও একনিষ্ঠ করবার উদ্দেশ্যে তা’ বিহিত হয়েছিল। বুদ্ধের বিপ্লব ও সর্বকল্যাণকর, যেহেতু মোহান্ধতা ঘুটিয়ে প্রকৃত শ্রেয়ঃ পথ দেখাবার উদ্দেশ্যেই তা’ সংঘটিত হ’য়েছিল।

বস্তুতঃ বলা যেতে পারে ভগবান্ বুদ্ধ পশুহিংসা-প্রধান বৈদিক যাগযজ্ঞাদির বিরোধিতা করে এক ঔপনিষদিক সত্যকে আপন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডনে নবভাবে আবার জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভূত করে দিতে চেয়েছিলেন, যে সত্য ক্রিয়াকর্মের বা মহোৎসবের আড়ম্বরে দীর্ঘকাল অন্তরালে পড়েছিল। তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত অনেকাংশে তা’ অসামান্য সফলতা লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে স্বসম্প্রদায়ের আত্মকলহ এবং শক্তিমান্ প্রতিদ্বন্দী হিন্দু সমাজনেতাদের প্রভাবে আর ব্যক্তিগত আক্রোশ বিধে তা বহির্দৃষ্টিতে ভারত থেকে প্রায় বহিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল, প্রচারিত হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম আমাদের সর্বনাশ সাধন করবে এবং বুদ্ধদেব প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিরোধী নাস্তিক। অথচ যে মহাসত্যকে তিনি কঠোর ভ্রপন্থায় লাভ করেছিলেন এবং “জগদ্ধিতায়” তার প্রয়োগ করেছিলেন

তা' আৰ্য্য সত্যকে কখনো কলুষিত করেনি, রীতির বৈচিত্র্য দিচ্ছে অধিকতর পুষ্ট করেছে বলা যায়। বুদ্ধদেবের জীবন চরিত আলোচনা করেও দেখা গেছে তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের প্রথমে বেদ-উপনিষদ এবং অন্যান্য যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থই আয়ত্ত করেছিলেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্তি দর্শনও তাঁর বৈরাগ্যের অন্ততম কারণ। নিজে হিন্দুগৃহে জন্মলাভ করে সে আচারে এবং পরিবেশেই বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। রাজ্য শুদ্ধোদন সর্বদা পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতেন। আহাৰ বিহারে অত্যন্ত শুচিতা ছিল বলেই নাম হয়েছিল শুদ্ধোদন। স্ততরাং এ কথা বলাতে নিশ্চয়ই তাঁর মহিমা খর্ব করা হবে না যে হিন্দুর চিরাচরিত উন্নত আদর্শের প্রভাব তাঁকে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছিল। সমগ্র শাস্ত্রসার আহরণ করে এবং নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কষ্টিপাথরে তা' পরীক্ষা করে সমগ্র জাতির বা বিশ্বের জন্ত বিলিয়ে গেছেন তিনি। প্রেম-মৈত্রী-করুণা, এটি তার নিজস্ব মহাদান। সর্বজীবে প্রেমের এমন বহিঃপ্রকাশ সমগ্র জীবন দিয়ে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তত্ত্বরূপে বা আদর্শরূপে আমরা বিভিন্ন আকরগ্রন্থে তার পরিচয় পেলেও জীবনে তা' প্রতিফলিত করেন প্রথম ভগবান বুদ্ধদেব। শুধু তাই নয়, যে মহাপ্রজ্ঞা এককালে কতিপয় উচ্চ স্তরের বিদ্বাদিকারীদের মাত্র আয়ত্ত ছিল, সে কঠিন তত্ত্বকে সেই মহাপ্রজ্ঞার সহায়ে একান্ত সহজ ও সরল করে গণমানসে তিনিই প্রথম পৌছে দেন এবং সামগ্রিক সন্ধীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করে "শৃঙ্খল বিধে" বলে বিশ্বজনের মনের ছায়া তুলে ধরেন সে মহাসত্যকে।

ভগবান বুদ্ধের এই করুণাঘন মূর্তির প্রকৃত পরিচয় ভারতবর্ষ এককালে লাভ করে থাকলেও পরবর্তী কালে তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি অনেকে এক বদ্ধমূল ধারণাই হ'য়ে আছে বুদ্ধদেব আমাদের হিন্দুর বেদ-উপনিষদ-আচার-নিয়ম-নিষ্ঠা, সব কিছুর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষরূপে আবির্ভূত

হয়েছিলেন, যে জন্তে বৌদ্ধবিহারগুলি পর্য্যন্ত আমাদের অগম্য স্থান বলে পরিগণিত হ'য়েছিল।

সম্রাট আকবরের আদেশে মহাপণ্ডিত আবুলফজল অনেক চেষ্টা করেও একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন নি। বিশেষ করে' পাশ্চাত্য মনীষীদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং গভীর অল্পসন্ধানের ফলে বর্তমানকালে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হ'য়েছে এবং তা' থেকে বহুবিধ তথ্যও ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে, যা' থেকে আমরা নূতনভাবে বুদ্ধের স্বরূপ জানবার সুযোগ পেয়েছি। এক্ষণে এ সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, বুদ্ধদেব কারো প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষরূপে কখনো তাঁর প্রজার প্রভাব দেখাতে আবির্ভূত হন নি, বরং বলতে পারি আমাদেরই বেদ-উপনিষদ প্রভৃতির অন্তর্নিহিত যে আদর্শ কঠিন আন্তর্য্যে বর্ধাবৃত হয়ে রয়েছে, যা' সমগ্র মানবের কল্যাণকর—ভগবান্ বুদ্ধদেব কঠোর তপশ্চাবলে সেই সুগভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করে মানব কল্যাণে তা' সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছিলেন, এক সরল অনাড়ম্বর সহজগ্রাহ্য পন্থার কৌশল নিয়ে। তাই মনে হয় ভগবান্ তথাগতের যে অমৃত পরিচয় দীর্ঘকালের ব্যবধানে আমাদের কাছ থেকে অপসৃত হয়ে ধূলিসমাক্ষন্ন হয়ে পড়েছিল তা' যেন নূতন করে আবার আমরা লাভ ক'রবার সুযোগ পেয়েছি, যা' হারিয়েছিল তা' যেন আবার ফিরে পেয়েছি বুদ্ধদেবের জীবন-চর্চায়। ভগবান্ তথাগত আমাদের এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে সমাসীন হোন্ ॥

নির্বাণ পরিচয়

বর্তমান যুগে 'নির্বাণ' শব্দটি এমন একটি শক্তি বহন করে যে, শব্দটি ঐতিহ্যগোচর হওয়া মাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের কথাই মনে পড়ে। তার কারণস্বরূপে বলা যায় বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ সমার্থক অমৃত, অজর, সত্য, জ্যোতিঃ, পরায়ণ, শরণ প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ গৃহীত হ'লেও ঐ পরম-পদটিকে অসাধারণ শক্তি মণ্ডিত করে একমাত্র ঐ একটি শব্দ দ্বারাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। আর্য ধর্মের বেদ-উপনিষদ্ গীতা, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে নির্বাণ শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার বাক্যেও ঐ পদটিকে ভগবৎ-প্রাপ্তি মোক্ষ অমৃত নির্বাণ এইরূপ নানাবিধ শব্দের সাহায্যে তুল্যভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে বলে একটা শব্দেরই উপর গুরুত্ব পতিত হয় নি। আরো একটি কারণ এই যে, আর্য ধর্মাত্মসারে ব্রহ্ম বা ভগবৎ—সত্তার চিরস্থিরতাই অমৃতত্ব বা নির্বাণ শব্দের অভিধেয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ব্রহ্ম বা শাস্ত্রত ভগবৎসত্তা অস্বীকৃত বলে ঐ পরম শব্দটি প্রকাশ করবার আর কোন উপায় নেই, আর তাতেই হয়েছে বহুবিধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

নির্বাণশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বৈষম্যও লক্ষ্য করবার মত। আর্যধর্মে নির্বাণ শব্দটি নিরু উপসর্গযোগে গত্যর্থক 'বা' ধাতু থেকে ভাবে অনট্ট করে নিপ্পন্ন। 'বান' অর্থাৎ গতি বা চাঞ্চল্য, 'নির্বাণ' অর্থাৎ গতিহীনতা বা স্থিরত্ব। এভাবে মানসিক যাবতীয় গতি বা বাসনাজনিত চাঞ্চল্যের চির অবসানে পরমায়ুতে ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠাই নির্বাণ বা মোক্ষপদের অভিধেয় হ'য়েছে, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'বান' অর্থ বন্ধন—নিস্কান বা নির্বাণ—বন্ধনহীনতা অর্থাৎ তৃষ্ণার বন্ধনহীনতাই নির্বাণ। তৃষ্ণা বা বাসনাই জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সাধনা দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয়ে বন্ধনাশ, স্তবরাং দুঃখরাহিত্য, তাতেই বন্ধনহীনতা আসে বলে নিস্কান। লক্ষ্য প্রায় একরূপ হ'লেও ব্যুৎপত্তিভেদ

যটেছে। বান শব্দের বন্ধন অর্থটি ধাতুপ্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শুদ্ধিপূত করে রক্ষা করা কঠিন। অবশ্য বন্ধন—‘বান্ধ’, তা থেকে ‘বান্’—এভাবে অপভ্রংশ শব্দরূপে পরিগণিত হ’তে পারে এবং পালিভাষাতে গৃহীতও হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ শব্দের যোগার্থ যা’ই হোক, নির্বাণে পদাভিধেয় তত্ত্বটি গভীর এবং তাকে চরম লক্ষ্য বলেই বৌদ্ধানুসারিগণ গ্রহণ করেছেন। নির্বাণের তাৎপর্যব্যাখ্যায় আচার্য্য ‘অনুরুদ্ধ’ “অভিধর্ম্মার্থনংগ্রহ” গ্রন্থে বলেছেন, নির্বাণ লোকোত্তর বিষয়রূপেই পরিগণিত। যার উৎপত্তি ও বিনাশ রয়েছে তাই হ’ল লৌকীয়। লোকোত্তর সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন—“কতমে ধম্মা লোকুত্তরা ? চত্তারো চ অরিয়মগ্গা, চত্তারি চ সামব ফলানি অনঙ্খতা চ ধাতু, ইমে ধম্মা লোকুত্তরা তি” অর্থাৎ চার প্রকার—আর্য্যমার্গ, চার প্রকার শ্রামণ্যফল বা মার্গজফল এবং অসংস্কৃত ধাতু, এই সব ধর্ম্মই লোকোত্তর। এই চারি আর্য্যসত্য দ্বারা শ্রামণ্য ফলের অন্তর্গতই হোল নির্বাণ বা পরমপদ। এই নির্বাণ স্বভাবানুসারে অদ্বিতীয়, কিন্তু অভিব্যক্তির স্তরভেদে দ্বিবিধ—“সউপাদিশেষ”, আর “অনুপাদি—শেষ নির্বাণ”। উপাদি হ’ল পঞ্চস্কন্ধেরই নামান্তর (কামনারূপ উপাদানাদি দ্বারা এদের পরিজ্ঞান হয় বলে পঞ্চস্কন্ধকে উপাদি বলা হয়)। উপাদির অভাব অনুপাদি। অর্থাৎ নির্বাণলাভের পক্ষে পঞ্চশীলাদির অনুসরণ, যোগমার্গ এবং তপঃপূতপ্রজ্ঞার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সকল অধিকারলাভ কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। এই কঠিন সাধনায়, নানাবিধ স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়, সাধনার চরম ফলটিই হ’ল অনুপাদি শেষ নির্বাণ। তার পূর্বে ক্রমধারায় অগ্রসর হ’য়ে সাধক যখন যাবতীয় ক্লেশগ্রাম ও বাসনাদি অতিক্রম করে যান, কেবলমাত্র মূল স্বন্দপঞ্চক অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তার কার্য্যকারিতা স্তব্ধ হ’য়ে যায়, তাদের সম্ভাব্য বিজ্ঞমান থাকে কিন্তু তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হ’য়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় “স-উপাদি শেষ-নির্বাণ”, আর—তদুপেক্ষে উদ্ভিত হয়ে সাধক যখন স্কন্ধপঞ্চকেরও বিলয় করে দেন,

“সর্ববিধ ধ্বংস”—অর্থাৎ কামনা বাসনা তৃষ্ণা, এমন কি মূল ধাতুগুলিও বিলীন হয়ে যায়—তখন বলা হয়, অল্পপাদিশেষ নির্বাণ।

পূর্বোক্ত এই তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঠিক যেন আৰ্য্য শাস্ত্রের সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধির বর্ণনা। সবিকল্প সমাধিতে মন ব্রজে বিলীন হয়েও সম্পূর্ণ ভেদহীন হ’তে পারে না,—স্বকীয় সত্তা এবং সাধ্যসাধকভাব বিদ্যমান থাকে। তথাপি বাবতীয় পার্থিব ক্লেশ বিদূরিত হয় বলে পরমানন্দেরও উপলব্ধি আসে। তারই উদ্দেশ্যে সর্ববিধ ভেদবোধ বিলয় করে আপন সত্তাটিকেও ব্রজের মধ্যে হারিয়ে একীভূততাই নির্বিকল্প সমাধি। দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্বাণ ও এ পথেই আপন রূপ প্রকাশ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নির্বাণকে প্রত্যক্ষগম্য বলেছেন—আৰ্য্যমার্গজ্ঞানের সাহায্যে এর প্রত্যক্ষ করতে হয়। “সচ্ছিকাতক” অর্থাৎ সাক্ষাৎকর্তব্য। এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন এনে পড়েছে যে নির্বাণ যদি সাক্ষাৎকরণীয় তত্ত্ব হয়ে থাকে, তবে “সর্বং শূন্যং”—এই সর্বশূন্যতাময় অভাবাত্মক তত্ত্বটির সঙ্গে বিরোধ ঘটে। সর্বাস্তিত্বহরিত অভাবাত্মক তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণ অসম্ভব।—বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ বিষয়তাদ্বারা এর বিদ্যমানতাই স্বীকার করা হ’ল। সুতরাং এ তত্ত্ব নিতান্ত অভাবাত্মক হ’তে পারে না। আর—বিদ্যমানতা স্থির হলে তত্ত্বরূপে তার পারমার্থিকতাই স্বীকৃত হ’ল। ‘অসৎ’ হ’তে পারে না। অথচ বৌদ্ধ শাস্ত্রে নির্বাণকে শূন্য, অনিমিত্ত, অপ্রনিহিত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এই অসঙ্গতি সমাধানের জন্তে বৌদ্ধ ব্যাখ্যাভূষণ বলে থাকেন—শূন্য কথাটি এখানে সর্বাস্তিত্বশূন্যতা অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। পাণ্ডিত্যাভিমানী বিরোধী ব্যক্তিগণই অস্তিত্বশূন্যতারূপ অভাবাত্মকতা প্রকাশ করেছেন। নির্বাণ রাগদ্বেষমোহশূন্য, এমন কি সর্ববিধ সংস্কার শূন্য—অবিচ্ছাদশূন্য তত্ত্ব,—এজন্তই এই তত্ত্বটিকে শূন্য বলা হয়। “ভব—নিরোধো নিব্বাণং……। নিব্বাণং ভগবা আহ সৰু গহু গমোচনং—(সংযুক্তনিকায়)।” আর এ

নির্বাণ পরিচয়

৫৯

তত্ত্বটি রাগাদি নিমিত্তরহিত বলেই অনিমিত্ত ও প্রনিধি—অর্থাৎ আসক্তি বা তৃষ্ণা রহিত বলে অপ্রনিহিত। বস্তুতঃ তা এক অদ্বিতীয় নিত্যতত্ত্ব। তাই তাকে অনন্ত, অচ্যুত, অকৃত অহুত্তর বলে অভিহিত করা হয়। এর আর শেষ অবসান নেই বলে তা অনন্ত। কোনরূপ চ্যুতি নেই বলে অচ্যুত “নিস্কানপদং অক্ষুতং” (সুত্তনিপাত)। প্রত্যয়াদি দ্বারা কৃত নয় বলে অকৃত বা নিত্য, এবং এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন তত্ত্ব নেই—তা’ই সর্বোত্তম; এজ্ঞে অহুত্তর। এসম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধের বাণীতে তা’ই প্রকাশিত হয়েছে, তিনি বলেছেন—“অস্থিভিক্ষবে অজাতং অকতং অনশ্বতং”। গজ্জিমিনিকায়ে নির্বাণ সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধের বাণী অধিকতর স্পষ্ট—, সেখানে তিনি বলেছেন—“অজাতং অজরং...অমতং...অহুত্তরং... নিস্কানং অজ্জ্বগমং”—জন্মহীন, জরাহীন মৃত্যুহীন এক সর্বোত্তম তত্ত্ব—সুতরাং নিত্য ধ্রুব।

এই নিত্যতত্ত্বটিকে তা’হলে নির্বাণ শব্দে পরিচিত করা হ’ল কেন? এর উত্তরে তাঁরা বলে থাকেন। তৃষ্ণাই সর্ববিধ বন্ধনের হেতু। তৃষ্ণা প্রাণিগণকে কামরূপ অরূপ যাবতীয় লোকে বন্ধন করে নানাবিধ ধোর কর্মে আবদ্ধ রাখে, দুঃখনাগরে ডুবিয়ে রাখে। এই তৃষ্ণার ক্ষয়েই দুঃখেরও ক্ষয়। নির্বাণে তৃষ্ণার ক্ষয় সাধিত হয়; তৃষ্ণার আত্যন্তিক ক্ষয়ই তৃষ্ণার নির্বাণ বা দুঃখনির্বাণ। ৬তৎহায় বিপ্লহানেন নিস্কানং ইতি বৃচ্চতি (সুত্তনিপাত) অর্থাৎ তৃষ্ণার বিনাশই নির্বাণ; একথা বলা হয়। “নির্বাণ” শব্দটি এখানে উপমাকারে প্রযুক্ত হ’য়েছে। অর্থাৎ তৃষ্ণাটি যেন প্রদীপের তৈল এবং দুঃখ হ’ল দীপশিখা। তৈল হেতু দীপশিখা প্রজ্বলিত থাকে, তৈলাভাবে সব শেষ,—নির্বাণিত হয়ে যায়। এই দীপনির্বাণের পরিচয়ে ‘নির্বাণ’ শব্দ দ্বারা এ তত্ত্বটি প্রকাশ করা হ’য়েছে। “নিস্কন্তি ধীরা যথায়ং পদীপঃ” (সুত্তনিপাত)

এতাদৃশ ব্যাখ্যায় আবার পূর্ব প্রশ্ন ঘুরে এল যে, নির্বাণ ত তা’হলে

ত্রিশ্রীবুদ্ধ যশোধরা

হুঃখধ্বংসমাত্রই—অর্থাৎ অভাবান্নিকা সর্বশূন্যতা। তা'তে এ তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণতা প্রভৃতি বিরূতির সঙ্গে পূর্বোক্ত বিরোধ পূর্বাবস্থায়ই থেকে যায়। এজন্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—নির্বাণ শান্ত স্বভাব। ক্লেশ-কর্ম-বিপাক থেকে যে হুঃখ উৎপন্ন হয় তথাবিধ হুঃখের নিরোধই শান্তি। এই শান্তির অপর পরিচয় সূখ। সূখ হলেও তা বিষয়জনিত সূখ নহে। “ন তু বেদয়িতং সূখং”। ভগবান্ বুদ্ধ নির্বাণের স্বরূপ-পরিচয়ে বলেছেন “নির্বাণং পরমং সূখং”। মজ্জিম নিকায়ের একই অধ্যায়ে ছ'বার, ধর্মপদে ও ছ'বার নির্বাণকে পরম সূখ বলা হইয়াছে।

“জিঘাচ্ছা পরমা রোগা সজ্জরা পরমা দুখা।

এতং ঞ্জা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সূখং ॥” ...ইত্যাদি।

অর্থাৎ ক্ষুধা কঠিন রোগ, সংস্কার দারুণ হুঃখ, এজন্ত ধীমান্ এই সত্যটি উপলব্ধি করে পরমসূখরূপ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। এই পরম সূখোপলব্ধির উপায়রূপেই পূর্বোল্লিখিত সউপাদিশেষ নির্বাণ ধাতু ও অন্তপাদিশেষ নির্বাণ ধাতু এই দু'টি প্রকার ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে আমরা নির্বাণের পরিচয়ে যে তত্ত্বটি উদ্ঘাটিত হ'তে দেখছি, তা'কে উপনিষদের সে অদ্বিতীয় পরম অমৃততত্ত্ব থেকে ভিন্ন বলে দূরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ, এই যে পরম সুখাভিধেয় নির্বাণ, তা' যদি হুঃখাদি শূন্য বলে শূন্য, আর স্বভাবতঃ “অজর, অমত, অকত” বলে অনন্ত ও ঞ্জব নিত্য হয়ে থাকে, তবে উপনিষদের পরম আনন্দ তত্ত্ব থেকে তার পার্থক্য কি দিয়ে করা যেতে পারে? বিশেষতঃ পরম সূখ আর সে পরম-আনন্দ একার্থক। যে আনন্দ “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাতঃ” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “ভূমের সূখম্” প্রভৃতি অজস্র শ্রুতিতে পরম সূখরূপী আনন্দাত্মক ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্যীভূত অমৃততত্ত্ব বলে পরিচিত, সেই অমৃততত্ত্বই যদি নির্বাণের ও স্বরূপ হয়ে থাকে তবে উভয়ে যে একই তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে

নির্বাণ পরিচয়

৬১

এ সম্বন্ধে বিকৃত বিচারের কোন অবকাশই থাকে না। পক্ষান্তরে অমুক্ত-মতবাদই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে যেমন “অথি ভিকখবে অজরং অমতং অকতং...নিক্কানং...” প্রভৃতি বুদ্ধবাণীতে অজর, অমৃত, অকৃত এবং অভয় পরায়ণ—প্রভৃতি শব্দে নির্বাণকে বিশেষিত করা হ’য়েছে, ঠিক তেমনি উপনিষদেও এই একই তত্ত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যক্ত রয়েছে—“এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্”—ইত্যাদি (প্রলোপনিষৎ)।

যদিও এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তি উঠতে পারে যে, মাণ্ডুক্য কারিকায় দেখা যায় আচার্য্য গৌড়পাদ স্পষ্ট করেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে উপনিষদুক্ত মতের প্রভেদ দেখিয়েছেন বলেছেন—“নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্” ইত্যাদি; তথাপি এখানে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায়, আচার্য্য গৌড়পাদ বিস্তৃত কারিকাবলম্বনে যে অদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেছেন, তাতে স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তে বাহ্যমাত্রের অসদ-রূপতা জ্ঞানমাত্রের সত্ত্বাস্থাপন প্রভৃতি দ্বারা বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে একান্ত সাম্যই যেন দেখান হ’ল, যে কথা আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন—যতপি বাহ্যর্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্র—কল্পনা চাঞ্চল্যবস্তুরসামীপ্যমিত্যাদি,—এই আশঙ্কা অপনোদনের জন্য উভয়ের অধিকতর সাম্য সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখাবার অভিপ্রায়েই এখানে গৌড়পাদ বলেছেন—

“ক্রমতে নহি বুদ্ধশ্চ জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ।

সর্বৈ ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্॥”

অর্থাৎ উপনিষদের অন্ত্যন্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৌদ্ধমতের একান্ত সাম্য থাকলেও যেমন পরমার্থদর্শিপুরুষের জ্ঞান কখনো বিষয়াদিতে লিপ্ত হয় না, স্বকীয় স্বভাববলে নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গরূপে অবস্থিতি করে—ঠিক তেমনি বাবতীয় আত্মাই (সর্বৈ ধর্মাস্তথা) এবং তদীয় জ্ঞানও কোথায়ও লিপ্ত হয় না, স্বভাবতঃই অসঙ্গরূপে বিরাজমান। একমাত্র স্থিরস্বভাব অসঙ্গ পুরুষ আগন্তুক-

দোষে-লিপ্ত বলে মনে হয় কিন্তু পরমার্থতঃ তিনি সর্বদাই একমুখ্যাব—
 অনন্দ-নির্মল। এ তত্ত্বটি বুদ্ধদেব বলেন নি। এটুকুই পার্থক্য। এর
 তাৎপর্য হ'ল পরমাত্মচিন্তায় বিলীন হলে বিষয়াতীত ব্রহ্মের উপলব্ধিতে
 যে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদ বর্জিত পারমার্থিক অদ্ব্যাবস্থার সংপ্রাপ্তি বা লাভ
 ঘটে—তা' প্রকৃতপক্ষে কোন উপার্জিত তত্ত্বলাভ নয়। এই অবস্থাটি
 শাস্ত্রত, একরূপ। দোষ নিবন্ধন তা এত কাল পরিজ্ঞাত হয় নি। দোষ
 নিরস্ত হওয়াতে স্বরূপ পরিজ্ঞাত হ'ল মাত্র। যেমন সূর্য্য ভাস্বরস্বভাব,
 মেঘের বিরোধিতায় দৃষ্টিগোচর হয় নি বলে সূর্য্যে কোন ধর্ম সংক্রামিত
 হয়েছে বলা ভুল—সূর্য্য আবৃতও হন নি, প্রকাশিতও হন নি যেমন
 ছিলেন তেমনটিই আছেন। মেঘ ফেটে গেল বটে, সূর্য্যে নূতন কিছু
 উদ্ভব হয় নি—এই আত্মার ক্ষেত্রেও তাই; প্রকৃতপক্ষে বন্ধনও হয় নি মুক্তিও
 হয় নি—যেমন ছিলেন আত্মা তাই আছেন—এই হ'ল উপনিষৎ সিদ্ধান্ত।
 বৌদ্ধমতে এই চিরস্থির এক স্বভাব আত্মতত্ত্বের স্বীকৃতি নেই বলে এই
 স্রীতিতে ব্যাখ্যা চলে না—এইখানেই পার্থক্য ঘটেছে।

কিন্তু তা'তেও মূল সত্যের পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি বলেই
 আমরা মনে করি। কারণ এই বিরোধটিকে দার্শনিক চিন্তাধারায় একটি
 প্রকারান্তর রূপে গণ্য করা যেতে পারে। বৌদ্ধমতে শাস্ত্রত আত্মা বলে
 পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করা হয় নি, সবই ক্ষণভঙ্গুর। আত্মা ও চিন্তাতিরিক্ত
 নয়, চিন্তাপ্রবাহকেই আত্মা বলে ব্যবহার করা হয়। যোগাভ্যাসের ফলে
 ক্রমশঃ নানাবিধ স্তর অতিক্রম করে চিন্তের যখন রূপ-অরূপ-কুশল-অকুশল
 সমুদয় অবস্থার উর্ধ্বে উঠে দাঁড়ান সম্ভব হয়, সেই অবস্থায় যে উপলব্ধি
 সর্বমনিত্যং দুঃখং ক্ষণিকং ইত্যাদি এবং তৎপরবর্তী যে চরম অবস্থা
 নিক্কানং পরমং সুখং, যা পূর্বে বলা হয়েছে “অনুপাদি শেষ নিক্কান
 বাতু”—যখন কোন কিছুই, স্ফুটাদিরও, বোধ নেই সেই অদ্ব্যাবস্থার
 সঙ্গে উপনিষদুক্ত মতের সত্যি করেই কি খুব গুরুতর পার্থক্য কিছু

নির্বাণ পরিচয়

৬৩

রহিল? তাই দেখি, উপনিষদ যেমন বলেছেন ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচয়ে—
 “ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্” তেমনি নির্বাণ পরিচয়েও
 খুন্দকনিকারে বলা হ’য়েছে, সূর্য চন্দ্রাদি সেখানে প্রকাশমান নন অথচ
 সেখানে অন্ধকার নেই—

“ন তথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি.....

অথ রূপা অরূপা চ সূখদুঃখা পমুচ্চতি।”

বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থাদি আলোচনা করে নির্বাণ সম্বন্ধে যে পরিচয়
 আমরা পেলাম, তা’থেকে যদি এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বুদ্ধের ‘নির্বাণ’
 কথাটি প্রকৃতপক্ষে সর্বাস্তিত্বরহিত শূন্যাত্মকতা নয়—রাগদ্বেষাদি অবিজ্ঞা-
 শূন্যতাময় নিত্য-অমৃত তত্ত্ব,—তা’হলে এ সিদ্ধান্তও সমর্থন করা যায় যে,
 বস্তুতঃ আর্য-উপনিষদের মূল সত্য ব্রহ্মাত্মক অমৃত তত্ত্বই বুদ্ধদেবের এই
 নির্বাণ। এই বিশ্লেষণে আজ এ কথাও তা’হলে প্রমাণিত হয় যে
 ভগবান্ বুদ্ধ হিংসাপ্রধান যোগবজ্রাদির নিন্দাকারী হ’লেও হিন্দু সভ্যতার
 প্রতিপক্ষরূপে কখনো আবির্ভূত হন নি, বরং আমাদেরই উপনিষদিক মূল
 সত্যকে আচারপ্রধান বহিরহুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য বর্ম থেকে কোষমুক্ত করে
 কঠিন জ্ঞানমার্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নূতন দৃষ্টির নূতন আলোকে উদ্ভাসিত
 করেই দিয়েছিলেন—তাই তিনি প্রকৃতই বিষ্ণুর অবতার!!

বৌদ্ধ নারী কবি

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার নারী কবিদের বিষয়ে পর্য্যালোচনাকালে স্বভাবতঃই পালি ভাষায় নারী কবিদের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং একটি তুলনামূলক সমালোচনাও হৃদয়ে জাগে। তারই কিছু রূপ এখানে ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি।

বৌদ্ধ সাহিত্য মূলতঃ বৈরাগ্যের সাহিত্য এবং স্বভাবতঃই সাংসারিক সুখভোগের বর্ণনায় বিরত। পুনরায় বৌদ্ধ নারী কবিদের সংখ্যাও বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ স্তম্ভপিটকের খুদক নিকায়ের অন্তর্গত খেরীগাথাতেই সন্নিবদ্ধ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কাকীপুরনিবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল খেরীগাথার “পরমখদীপনী” নামক যে টীকা রচনা করেন, সেই টীকা থেকে বৌদ্ধ নারী কবি খেরীগণের জীবনের বিস্তৃত বিবরণও সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া যায়। কাজেই একটি তুলনামূলক সমালোচনার ক্ষেত্র যেন প্রস্তুত হয়েই আছে।

বৈদিক সাহিত্যের ঘোষা, গোধা, বিশ্বারা প্রভৃতি নারী কবি, সংস্কৃত সাহিত্যের বিজ্জা, বিকটনিভম্বা, মারুলা, মোরিকা প্রভৃতি নারী কবি এবং প্রাকৃত সাহিত্যের রেবা, রোধা, অম্বলদ্ধির সঙ্গে বৌদ্ধ নারী কবিগণের যেটি মৌলিক পার্থক্য, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যের সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য। বৈরাগ্যপ্রধান বৌদ্ধ সাহিত্য জাগতিক বিষয়কে দুঃখময় মনে করেন ‘সর্বমিদং দুঃখম্,’ এই বৌদ্ধ সাহিত্যের অভিমত। কাজেই প্রেম, প্রেম-বিভবময় স্বভাববর্ণন, মহুখ্যাদির সাধারণ চিত্তবৃত্তির অল্পক্রমে সাধারণ সাহিত্যস্থলভ বর্ণন বৌদ্ধ সাহিত্যে নেই। একটি অতীন্দ্রিয়, অতিমানস উচ্চস্তরের পর্যায়ে সমাক্রুত চিত্তের গগনবিহারী ভাবরাশি এই সাহিত্যের উপজীব্য। প্রসঙ্গক্রমে আমরা নেমে আসি জাগতিক জীবনে, আমাদের এই সুখদুঃখময় ধূলার ধরণীতে। বৌদ্ধ খেরীগণের রচনাতেও এই

বৌদ্ধ নারী কবি

৬৫

অপার্থিব চিন্তালীলা স্মৃতিচর্চা। তাই তাঁদের রচনা এত মনোরম, এত উপভোগ্য। পট্টাচারার শিষ্যরচিত দুইটি গীতি বাদ দিলে আমরা খেরীগাথার আরো ৭১ জন খেরী বা বৌদ্ধ নারী কবি স্থবিরার সন্ধান পাই; এবং এই গ্রন্থে প্রায় ৫০০ শতের অধিক শ্লোক সন্নিবদ্ধ রয়েছে। বৌদ্ধ নারী কবিদের রচনায় সর্বত্র বৌদ্ধ আদর্শের বিশেষতঃ—ত্যাগ ও নির্বাণের মহিমা হয়েছে পরিকীর্তিত। তবে গাথা থেকে বিশেষতঃ টীকার সাহায্যে আমরা প্রত্যেকটি গাথার খেরীর আত্মকথা জানতে পারি। এই আত্মকথায় তাঁদের জীবনের এমন একটি স্পষ্ট ছবি অঙ্কিত হয়েছে—যা' মানবমনকে অতি সহজেই মুগ্ধ করে। এঁদের মধ্যে বহু নারী পুত্রাদির শোক অপনোদনের জন্য হলেন সন্ন্যাসিনী, কেওবা রূপগুণ-সংযুক্ত শ্রেষ্ঠ প্রেমিকের প্রেমকে উপেক্ষা করে করলেন বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘকে বরণ; স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিতা পত্নী যেমন সংসার ত্যাগ করেছেন, তেমনি ধর্মের টানে বারবনিতারা পঙ্কিল পথ থেকে নির্গল সত্যমার্গে হয়েছেন অগ্রসর। অবশ্য নারী জীবনের এই দিকটির বর্ণনা মনোরম হলেও প্রাসঙ্গিক। আসল কথা এঁদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ভুজের মধ্যে ধর্ম ও মোক্ষই উপজীব্য, অল্প দুইটি পরিত্যজ্য। এ জন্ত ভারতের অসংখ্য নারী কবিদের রচনায় যেমন মলয় পবন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, বসন্তাগম ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে নারী হৃদয়ের স্নেহময় কাতর নিবেদন, আকৃতি আছে বিজড়িত, মুহূর্মুহঃ তাঁরা বলে উঠেন : যে আশুন ঘর পোড়ায়, নগর দাহ করে, সেই আশুনই তো সর্বজন রক্ষক, সর্বজনবল্লভ; আমার প্রেমাধীশ্বর যিনি—তিনি আমাকে যতই জালিয়ে পুড়িয়ে থাক করুন না কেন, তিনিই আমার দয়িত, আমার প্রিয়তম প্রাণ-সর্বস্ব। অত্যাধিক বৌদ্ধ নারী কবিরা বলছেন : চাই না বন্ধন, চাই না জগতের ক্ষণিক সুখভোগ, আমরা চাই অর্হৎ নির্বাণ; মুক্তি। জননী মুক্তা বলছেন : ১১ নং গাথায়—

স্বমুখা সাধু মুক্তমুহি তীহি খুজ্জহি মুত্তিয়া ।

উত্থলেন মূলেন পতিনা খুজ্জকেন চ ।

মুত্তমুহি জাতিমরণা ভবনেত্তি সমুহতা ॥

অর্থাৎ সত্যই আমি মুক্ত ; ত্রিবিধ বন্ধ পদার্থ থেকে—উত্থল, মূল ও মুক্তদেহ স্বামী থেকে—আমার মুক্তি গৌরবময় । কিন্তু তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর মুক্তি—তুম্বার উন্নতলনে আমি জাতি ও মরণের গ্রাস থেকে মুক্ত ।

একদিকে প্রাকৃত ভাষায় নারী কবি মাধবী বলছেন :

গুমেন্তি জে পহতং কুবিঅং দানা ঋ জে পসঅঅন্তি ।

তে ক্সিঅ মহিলাগাঁ পিআ সেনা সামি ক্সিঅ অরাজা ॥—এই নারী কবি মাধবী খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীরও পূর্বেকার সময়ের কবি—তিনি বড়ই গৌরব করে—প্রাণের আনন্দে বলছেন : যে সকল স্বামী প্রভুত্বের ভাবটুকু মনে মনে গোপন করে, স্ত্রী কুপিতা হলে তাঁকে দাসের মত অতুলন বিনয় প্রসাদন করেন, তাঁরাই হচ্ছেন মহিলাদের প্রিয়, অত্যাগত স্বামীরা সব হতভাগা ।—

তেমনি অত্মদিকে বোদ্ধ নারীকবি স্বমঙ্গলের মাতা বলছেন : অতীতের রাগ ঘেঁষাদি বর্জন করে আমি স্বচ্ছন্দে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হই । স্থখী, আমি সত্যই স্থখী (২১ নং গাথা) ॥

একদিকে অত্নতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নারী কবি শীলা ভট্টারিকা বেগন দূতী প্রেরণ করে নায়ককে করছেন অতুলন, বিনয়—সম্মুখে উপস্থিত প্রিয়কে বলছেন :

‘স্বমপি বশগো মানব্যার্থেবিচিস্তয় নাথ হে

কিসলয়মুদুর্জীবেদেবং কথং প্রমদাজনঃ’ ।

অর্থাৎ তুমিও মানব্যার্থিতে হলে আক্রান্ত, হে নাথ—তা হলে চিন্তা কর—নবপল্লবকোমলা এই নারী আর কি করে বাঁচতে পারে ?

বৌদ্ধ নারী কবি

৬৭

অন্তদিকে অন্ততমা শ্রেষ্ঠা থেরী সেলা (শৈলা) বলছেন :
(৩৫ নং গাথা) —

‘সন্তিস্থলুপমা কামা খদ্ধানম্ অধিকুট্টনা ।

যঃ স্বং কামরতিং ক্রসি অরতি দানি সা মমং ॥ ৫৮

সন্ধথ বিহতা নন্দি তমোক্খন্ধো পদালিতো ।

এবং জানাহি পাপিম নিহতো ভমসি অন্তক ॥৫৯

অর্থাৎ ভোগের আনন্দ শূলের মত আমাদের নখর দেহ বিদ্ধ করে। তুমি বল যাকে স্থখ, সে তো আমার কাছে মূল্যহীন (৫৮)। ভোগের প্রতি অনুরাগ প্রশমন করেছে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হয়েছে দূর। হে পাপিন! আমার কাছে তুমি চিরতরে নষ্ট হয়েছে—তুমি একথা জেনে রেখো’। এভাবে থেরীরা বারংবার বলছেন : ‘আমি বুদ্ধবাক্য শ্রবণ করে সংবিশ পেয়েছিলাম’ (২৯, ৪০); ‘সর্বদা নির্বাণ-প্রার্থিনী আমি বুদ্ধকথা’ (৩১, ৪৬); ‘আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিয়েছি’ (৩৫, ৫৩); ‘ষড়্-অভিজ্ঞা আমার কাছে জীবন্ত সত্য; বুদ্ধের আদেশ পালিত হয়েছে’ (৩৮, ৭১)। —অর্থাৎ থেরীদের মনোভূক্ত শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের অমল চরণকমলে চিরতরে লীন হয়ে গেছে; তাতেই তাঁরা মাতোয়ারা—তন্মিন্ন অস্ত্র কিছুতে তাঁদের রতি নেই—মার তাঁদের কাছে সর্বথা পরাজিত। স্বদ্ধ, আয়তন ও ধাতুর জ্ঞান তাঁরা লাভ করেছেন, জীবের নির্বাণপ্রাপ্তির সর্বপ্রধান অন্তরায় হচ্ছে অবিজ্ঞা বা পরমার্থ সত্যের অন্তর্গলন্ধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগ, ঘেব, মোহ, হিংসা ইত্যাদি এবং তজ্জনিত কাম ও তৃষ্ণা প্রভৃতি। প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা অর্থাৎ সংসার ত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা এই সমস্তকে পরাভূত করতে হয়—তাতে ধীরে ধীরে কায়ভাঙ্গ, বাক্ভাঙ্গ, চিত্তভাঙ্গি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সপ্ত বোধাঙ্গ এবং ষড়্-অভিজ্ঞা প্রভৃতির লাভ হয়। এতেও কিন্তু নির্বাণ সম্ভবপর হয় না, কারণ তাতে সম্যক্ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সম্যক্ জ্ঞান লাভের উপায় তো একমাত্র স্বদ্ধ, আয়তন, ধাতুর বিশ্লেষণ, তাদের অনিত্যতা ও নিঃসারতার

উপলব্ধি। অষ্টাদশ ধাতু সংসারে জীবকে বদ্ধ করে রাখে, তা' থেকে থাকতে হবে দূরে। এ সমস্ত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হলে তো হবে নির্বাণ। খেরীগাথার জননীরা এর উপলব্ধির জ্ঞাত ছিলেন লালায়িত; বুদ্ধদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন তাঁরা উচ্চ-স্থূচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে হয়েছিলেন সমারূঢ়।

এটি সত্য যে, এঁদের মধ্যে সকল খেরীরই বৈরাগ্য অহেতুক নয়। এঁদের অনেকেই বৈরাগ্য সহেতুক—যেমন ইসিদাসী (৭২); বেচারী তিন-তিনবার বিবাহ করলেন, তিন-তিনবারই হলেন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত। মুক্তার বিবাহ হলো নিষ্ঠুর কুঁজোর সঙ্গে (১১); নন্দার বর বিবাহের পূর্বক্ষেণেই গেলেন মারা (১৯); স্নমঙ্গলাজননী নিষ্ঠুর স্বামীর ও রান্নাঘরের অত্যাচারে ছিলেন অস্থির (২১); বন্ধুবিয়োগে সামা হলেন অধীরা (২৮); একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে উন্মিরি হৃদয়ের স্বৈর্ঘ্য হারালেন (২৩); হতভাগ্য পটীচারী—দুই পুত্র, স্বামী, মাতাপিতা, ভ্রাতা সকলকে হারালেন (৪৭); বিধবা ছন্দা দরিদ্রা, সর্বস্বহীনা, নিঃসহায়া (৪৯); বৈসিখি পুত্রহারী (৫১); কিসা গোঁতমী হারালেন স্বামী-পুত্র (৬৩); ভদ্র কুণ্ডল-কেনা আত্মরক্ষাকল্পে স্বামীকে করলেন হত্যা (৪৬); উৎপলবর্ণা নিজের অজ্ঞাতসারে স্বীয় কন্যার স্বামীর সঙ্গে হলেন বিবাহিতা (৬৪)—এঁরা ছাড়াও তো কয়েক জন আছেন—যাদের বৈরাগ্য সত্যি অহেতুক—যেমন, ধর্মী (১৭)। তিনি উপযুক্ত পাণ্ডে হয়েছিলেন সমর্পিতা, ছিলেন চির আদরে লালিতা পালিতা; কিন্তু সংসারে তাঁর আসক্তি নেই; স্বামীর জীবদ্দশায় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা সম্ভবপর হলো না, স্বামীর মৃত্যুর পরেই তিনি সংসার পরিত্যাগ করলেন। অনোপমা (৫৪)—তাঁকে কত প্রেমিক বিবাহের জ্ঞাত সাধ্য-সাধনা করলেন, তিনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। গুস্তা (৫৬) ও রোহিণী (৬৭) ও বিবাহে সম্পূর্ণ অরাজী। রাজকন্যা স্নমেন্দা রাজপুত্র বরকে করলেন উপেক্ষা।

বৌদ্ধ নারী কবি

৬৯

এবং নিজেই কেবল সন্ন্যাসিনী হলেন না, মা-বাবাকেও বৌদ্ধধর্মের পরম সত্যের উপলব্ধির প্রতি অগ্রসর করিয়ে দিলেন।

এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই—থেরীরা তো মুক্তিমार्গের অনুসরণকারিণী সন্ন্যাসিনী—সংসার ত্যাগ করে এসেছেন—বৈরাগ্য তাঁদের সহৈতুকই হোক, অহৈতুকই হোক। কিন্তু এদের সকলেরই একটি বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে উপায় নেই—সেটি হচ্ছে, এঁরা তো নিজের দুঃখের জন্ত, নিজেকে কুপথে টেনে নেওয়ার জন্ত, বা অজ্ঞ কোনও কারণে—এতগুলি বৌদ্ধ-নারী-কবি কোনও জায়গায়, একটি ক্ষেত্রেও একবারের জন্তও কোনও পুরুষকে একটুও কটুক্তি বা দোষারোপ করলেন না। বরং উন্টো দিকে বললেন : নিজেকে দোষারোপ করে, নিজের কপালকে দায়ী করে, যেমন সামা (২৯) উত্তরা (৩০), বড়টেনী (৩৮)। সীহা (৪০) আত্মহত্যা করলেন, কিন্তু কোনও পুরুষের প্রতি কটাক্ষও করলো না। থেমা (৫২), শুস্তা (৫৬), উপচালা (৬); শিশুপচালা (৬১) এঁরা সাংসারিক নানারকমের বিপর্যয়ের মধ্যে কেবল নিজের ভাগ্যকেই দিলেন দিক্কার।

নারীদের এই মহত্ব, মহামহিমা যে কত বড় মহত্ব, কত বড় উদার হৃদয়ের পূর্ণ অভিব্যক্তির স্বমায় বিমণ্ডিত, তা থের-গাথার স্থবিরদের সঙ্গে জননীদের তুলনা করলেই সহজে স্থম্পষ্ট হবে। থেররাও সংসার ত্যাগ করেছেন; আনক্তিহীন, কারো প্রতি রাগ ঘেঁষ মোহ থাকবার কথা নয়। ফলতঃ থের ও থেরী একই স্তূর্ণপদকের—সন্ন্যাস ধর্মের, ভিক্ষুধর্মের—এপিঠ ও-পিঠ। কিন্তু কি ভীষণ পার্থক্য। ‘থের’রা অমনি কথায় কথায় নারীদের কেবল কটুক্তি করে না—পুরুষের বন্ধনের, যত প্রকার দুঃখ দৈন্ত, সব কিছুই মৌলিক কারণ বলে অনায়াসে ঘোষণা করে তাদের গালিগালাজ করতে সুরু করে দেয়। উদাহরণ দিয়ে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না—কিন্তু এটা সত্য যে, থেরগাথা গ্রন্থের সর্বত্র এই ভাব বিদ্যমান। কিন্তু এ কেন? আমাদের শাস্ত্রই তো বলে :

“স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু”—জগতের সর্বত্র যে যেখানে যত রমণী আছেন, তাঁরা সকলেই আত্মশক্তি, জগজ্জননীর অংশ, তাঁরা সকলেই আমাদের জননী। এক হাতে তো তালি বাজে না—থারাপ কাজ অল্পাধিক হলে উভয় পক্ষই তো দায়ী, সমান অসমান বাই হোক। তবে মহীয়সী নারীদের শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁদের মস্তকেই—দোষের পসরা চাপানো কেন?

খেরীগাথার কাব্য-মূল্য, ধর্মমূল্য যতই না হোক এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, জননীদের যে সর্বসহা ধরিত্রীরূপ এ গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তজ্জন্তু জগতের সমগ্র পুরুষসমাজ খেরীগণের চিরকাল পাদবন্দনা করবেন। তারপর ভারতের ঘোর দুর্দিনের সময় শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ও জননী গোপার আবির্ভাবে এবং তাঁদের ভাগবতী নীনার প্রভাবে দিকে দিকে যে জ্ঞানদ্যাতি সংপ্রসারিত হয়েছিল, ভারতের প্রতি গহন কোণ থেকেও ঘন তমিশ্রা কি ভাবে অপমৃত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রোজ্জ্বলতম সাক্ষ্য প্রদান করে এই খেরীগাথা। জননীরা যখন মুক্তকণ্ঠে কথা বলতে পারেন, নির্ভয়ে চলতে পারেন, ধর্ম মার্গে বিনা বাধায় বিচরণ করতে পারেন, তখনই দেশে শ্রেষ্ঠ যুগ বিद्यমান। সেই হিসাবে যুগযুগান্তরের ভারতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘খেরীগাথা’ এবং তজ্জন্তুই এ গ্রন্থ অতুলনীয় এবং আমাদের ভারতের অক্ষয় সম্পদ।

বুদ্ধ-পরম্পরা

ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। কিন্তু আলোচনার অভাব হেতু বুদ্ধ-পরম্পরা সম্বন্ধে অনেকেই কিছুই জানেন না। ফলে পিতা শুদ্ধোদন যখন বুদ্ধকে বলেছিলেন, “ন তে পুত্র বংশো ন চর ন চর সত্যপুঙ্গবাতি” অর্থাৎ হে পুত্র! শাক্যবংশের ক্ষত্রিয় তনয় তুমি, ভিক্ষা করা তোমার সাজেনা—‘বংশ। তে স্ত্রতবর, মহাসম্মতাদীষু* অনেককথতিয়নতসহস্বেষু একরাজুসভেনাপি ন ভিক্ষাচরিতপূর্বো তি।’ অর্থাৎ না, পুত্র; না, তুমি ভিক্ষাচরণ করোনা, তুমি শাক্যশ্রেষ্ঠ। হে পুত্র! মহাসম্মত প্রমুখ অনেক শত ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে তোমার বংশের কোনও রাজশ্রেষ্ঠ কখনও পূর্বে ভিক্ষাচরণ করেনি—এবং তার প্রত্যুত্তরে সিদ্ধার্থ সম্যক সংবুদ্ধ বলেছিলেন—‘তব এসো বংশো মম বংশো পন বুদ্ধবংসো তি’—অর্থাৎ “এটা আপনার বংশ, আমার বংশ কিন্তু বুদ্ধ বংশ”—এই উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রকৃত অর্থ বুদ্ধপরম্পরার বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় না। বুদ্ধ জয়ন্তীর বৎসরে এই বিষয়ে পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি।

আতনাতিয় স্তু বুদ্ধবংশপরম্পরা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বসুছেন :—

‘এতে চাণ্ড্ৰো চ সংবুদ্ধা অনেকসতকোটিয়ো।

সবেব বুদ্ধা সমা সমা সবেব বুদ্ধা মহিদ্ধিকা ॥’

অর্থাৎ একুশ অনেক শতকোটি আরো অন্ত্যন্ত বুদ্ধেরা আছেন; এই সকল বুদ্ধ সকলেই সমান; সকল বুদ্ধই মহা ঋদ্ধিসম্পন্ন। ২৭

* মহাসম্মত ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যে আদি রাজা; জনসাধারণের সম্মতিক্রমে রাজা হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম মহাসম্মত ॥

(১) মহাবোধিবংশ, ed. by S. Arthur Strong, London, Pali Text Society, 1891, p. 40.

কিন্তু যে সকল বুদ্ধের সঙ্গে ভগবান্ গোতম শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হৃৎসংশ্লিষ্ট ছিলেন অর্থাৎ গোতম বুদ্ধের ধর্মের বিশেষ যোগাযোগ ছিল,— তাঁদের নাম দিতে গিয়ে মহাপদানন্ত ও পূর্বোক্ত আতনাতিয় স্তম্ভ বুদ্ধবংশে উল্লিখিত ২৪ জন বুদ্ধের নামের মধ্যে কেবল ছয়জন বুদ্ধের নাম দিয়েছেন এবং দীঘনিকায়ও এই ছয় জনের নামই পরিদৃষ্ট হয়— যথা, বিপস্‌সি, সিধি, বেস্‌সভ্‌, ককুসন্ধ, কোণাগমন ও কস্‌সপ। অবশিষ্ট যে আঠার জনের নাম বুদ্ধবংশে আছে, তাদের নাম অত্র চারিটি নিকায়ে দৃষ্ট হয় না।

বুদ্ধবংশ^২ খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত এবং ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত বলে সর্বজনগ্রাহ্য। বুদ্ধবংশে নিম্নলিখিত ২৪ জন বুদ্ধের নাম পরিদৃষ্ট হয়, যারা ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধের পূর্বে আবির্ভূত হয়ে মাহব্‌ষের কল্যাণের পথ অব্যাহত, উন্মুক্ত করেছিলেন—

- (১) দীপঙ্কর (২) কোণ্ডঙ্গ (৩) মঙ্কল (৪) সূর্যম (৫) রেবত (৬) নোভিত (৭) অনোমদস্‌সি (৮) পছুম (৯) নারদ (১০) পছুমত্তর (১১) সূমেধ (১২) সূজাত (১৩) পিয়দস্‌সি (১৪) অখদস্‌সি (১৫) ধম্মদস্‌সি (১৬) সিদ্ধাথ (১৭) তিস্‌স (১৮) ফুস্‌স (১৯) বিপ্পস্‌সি (২০) সিধি (২১) বেস্‌সভ্‌ (২২) ককুসন্ধ (২৩) কোণাগমন (২৪) কস্‌সপ। মহাবস্তু

(২) বুদ্ধবংশ ও চরিয়্যা—পিটক। Ed. by Rev. Richard Morris. Part I, Text. London, Pali Text Society (Oxford University Press), 1886.

বুদ্ধবংশের মধুরট্টাবিলাসিনী নামক টীকা। Madhuratttha—vilasini nama Buddhavamsatthā—katha of Bhadantachariya Buddha-datta Mahathera. Ed. by I. B. Horner, London, Pali Text Society (Oxford University Press), 1946.

অবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে ভূতপূর্ব বুদ্ধগণের একশতাধিক নাম পরিদৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে দীপঙ্কর (পৃ: ১৪২) ও মঙ্গল বুদ্ধের (পৃ: ২৪২) বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর ৫৪ জন বুদ্ধের নামের একটি তালিকা প্রদান করেছেন।

মহাবান ও হীনবান প্রদত্ত বুদ্ধ নামের মধ্যে দীপঙ্কর, কোণ্ডঙ্ক, মঙ্গল, পহুমত্তর, পিয়দস্‌সি, অখদস্‌সি, তিস্‌স, কুস্‌স, বিপ্পস্‌সি, সিথি, বেস্‌সভ্‌, ককুসন্ধ, কোণাগমন (কনকাগমন), কস্‌সপ—এই কয়জন বুদ্ধের নাম উভয় যানেই দৃষ্ট হয়। মহাবস্তুর কনকপর্বত এবং পালিসাহিত্যের কোণাগমন একই ব্যক্তি নিশ্চয়ই।

গৌতমের ঠিক পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধই ব্রাহ্মণ। গৌতম যে পাত্র করে স্বজাতা থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেই পাত্র মহাকাল নামক নাগরাজের হৃদে প্রবিষ্ট হয়ে পূর্ববর্তী বুদ্ধত্রয়ের পাত্রকে অতিক্রম করে অবস্থান করতে থাকে।

বুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধ সকলের বিশেষ সম্মানাই ছিলেন। চীনদেশীয় গ্রন্থকারদের মতে ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কস্‌সপের মত দীর্ঘকাল অনুশ্রুত হয়েছিল। কিন্তু এই তিন জনের পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধের মতাবলী বিশেষ স্থানিচ্ছ লাভ করে নি। এই তিন জন অর্থাৎ বিপ্পস্‌সি, সিথি ও বেস্‌সভ্‌ শিষ্যদের জন্ত কোনও মত প্রচার করেন নি; তাঁদের রচিত “প্রাতিমোক্‌” ছিল না। এই জন্ত তাঁদের মহানির্বাণের পর তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে সম্ভবদ্বন্দ্ব শিথিল হয়ে পড়ে।

খুদ্ধকনিকায়ের অন্তর্গত চতুর্দশ গ্রন্থ বুদ্ধবংশে ২৮টি সর্গ; তন্মধ্যে শেষের তিনটি সর্গই সমধিক কোতূহলোদ্দীপক। ২৬শ অধ্যায়ে গৌতম বুদ্ধের

(৩) Emile Senart-র সংস্করণের ১১০—১২২ পৃ: এবং ১৩৬—১৩৭ পৃ: দ্রষ্টব্য।

বংশ। ২৭শে বুদ্ধদের নামাবলী ও কল্প সমূহের একটা সারসংক্ষেপ এবং সর্বশেষ সর্গে ভগবান্ বুদ্ধের ধাতুবিভাগ বর্ণন। ২৭শ সর্গ বা বুদ্ধপ্রকীর্ত-খণ্ডে ভগবান্ গৌতম বলেছেন—

“অহং এতরহি সংবুদ্ধো, মেত্তেয্যো চাপি হেস্‌সতি”। ১৯ক

এই যুগে আমিই সংবুদ্ধ, পরে মৈত্রেয় আসবেন। বুদ্ধ পরম্পরায় ভগবান্ শাক্য বুদ্ধ পঞ্চবিংশ সংখ্যক বুদ্ধ এবং অনাগত বুদ্ধ মৈত্রেয় ॥ ললিত-বিস্তারের মতে ভগবান্ বুদ্ধ পৃথিবীতে আগমন সময়ে মৈত্রেয়কে স্বর্গে তাঁর নিজ স্থানে প্রতিনিধি স্বরূপে নিযুক্ত করে এসেছিলেন।

কৌতূহলী উৎসাহী পাঠকবৃন্দের সহজ হৃদয় মূলগ্রন্থ পাঠ-পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্ত আমরা বুদ্ধবংশের শেষ তিনসর্গের মূল এবং বদ্ধান্তবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

২৬ ॥ গৌতম-বুদ্ধ-বংসো

অহম্. এতরহি বুদ্ধো গৌতমো সাক্যবডনো ।
 পধানং পদহিহান পন্তো সংবোধিমুত্তমম্ ॥ ১
 ব্রহ্মনা যাচিতো সন্তো ধম্মচক্রং পবত্তয়িম্ ।
 অট্টারসন্নং কোটীনং পঠমাভিসময়ো অহ্ ॥ ২
 ততো পরঞ্চ দেসেসন্তো নরদেবসমাগমো ।
 গণনায় ন বত্তবেবা ছুতিয়াভিসময়ো অহ্ ॥ ৩
 ইহ্ এবাহং এতরহি গুবাদিং মম অত্রজং ।
 গণনায় ন বত্তবেবা ততীয়াভিসময়ো অহ্ ॥ ৪
 একো ব সন্নিপাতো মে সাবকানং মহেসিনং ।

বঙ্গানুবাদ

- ১। আমি এখন শাক্যবর্ধন গৌতম বুদ্ধ; দুষ্কর কার্য করে আমি উত্তম সংবোধি প্রাপ্ত হয়েছি।
- ২। (মহা) ব্রহ্মা কর্তৃক যাচিত হয়ে আমি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছি। তখন (দেব ব্রহ্মা মাহুঘের) আঠারকোটিগণের প্রথম ধর্মজ্ঞান (অভিসময়জ্ঞান) হয়েছিল।
- ৩। তারপর উপদেশের সময় যে নরদেবগণের সমাগম হয়েছিল, তা' গণনায় বক্তব্য নয়; (তখন) দ্বিতীয় বার ধর্মজ্ঞান হয়েছিল।
- ৪। এখন আমি (শিষ্য ও প্রশিষ্য) সমূহ আমার পুত্রগণকে উপদেশ দিয়েছিলাম; তাদের সংখ্যাও গণনা করা যায় না; তাদেরও তৃতীয় বার জ্ঞান হলো।

শ্রীশ্রীবৃদ্ধ যশোধরা

অদ্ভুতলসসতানং ভিক্খুনাসি সমাগমো ॥ ৫
 বিরোচমানো বিমলো ভিক্খুসংঘস্ স মজ্জতো ।
 দদামি পত্খিতং সববং মণীব সববকামদো ॥ ৬
 ফলম্ আকংখমানং ভবচ্ছন্দজহেসিনং ।
 চতুসচ্চ পকাসেসি অনুরূপায় পাণিনম্ ॥ ৭
 দসব্বাসসহস্মানং ধম্মাভিসময়ো অহু ।
 একদ্বিন্নং অভিসময়ো গণনাতো অসংখ্যো ॥ ৮
 বিত্তথারিকং বহুজ্ঞপ্পং ইদং ফীতং সুফুল্লিতম্ ।
 ইধ ময়ং সাক্যমুনিনো সাসনং সুবিশোধিতম্ ॥ ৯
 অনাসবা বীতরাগা সন্তুচিত্তা সমাহিতা ।

৫। আমার মহর্ষি শিষ্যগণের এক সম্মেলন হয়েছিল ; তাতে সাড়ে বার শত ভিক্ষু সম্মিলিত হয়েছিলেন ।

৬। সকল বাহু পূর্ণকারী মণির মত আমি প্রোজ্জল ও বিমল হয়ে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রার্থিত সকল কিছু প্রদান করি ॥

৭। ভবতৃষ্ণা ত্যাগকারী এবং স্রোতাপনাদি চতুর্বিধ ফলাকাজ্জাকারী প্রাণীদের প্রতি অনুরূপা বশতঃ আমি চতুঃ সত্য প্রকাশ করেছি ।

(১) স্রোতাপত্তি, সন্ধাদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত ফল ॥

[ওষ—স্রোত বা প্লাবন,—চারি প্রকার :—(১)

কামোষ ; (২) ভবোষ ; (৩) দৃষ্টোষ ভাস্তধারণা ; (৪) অবিত্তোষ ॥]

৮। দশবিধ সহস্রগণের ধর্মজ্ঞান হয়েছিল ; হু'একজনের ধর্মজ্ঞান গণনায় অসংখ্য ॥

৯। এখানে শাক্যমুন আমার বিত্তারিক, বাহুজ্ঞ, সমৃদ্ধ ফীত ও সুফুল্লিত শাসন সুবিশোধিত হয়েছে ।

- ভিক্ষু নেকসতা সবেব পরিবারেস্তি মং সদা ॥ ১০
 ইদানি যে এতরহি জহন্তি মানুসং ভবং ।
 অগ্নন্তমানসা সেথা তে ভিক্ষু বিঞ্ঞু গরহিতা ॥ ১১
 অরিয়ঞ্জসং থোময়ন্তা সদা ধম্মরতা জনা ।
 বুজ্জ্বিস্সন্তি সতিমন্তো সংসারসরিতা নরা ॥ ১২
 নগরং কপিলবথু মে রাজা সুদ্ধোদনো পিতা ।
 ময়ং জনেন্তিকা মাতা মায়্যা দেবী তি বুচ্ছতি ॥ ১৩
 একুনতিংসবস্সানি অগারং অজ্জ্ব অহং বসিং ।
 রামো সুরামো সুভতো তয়ো পাসাদমুত্তমা ॥ ১৪
 চত্তারীসহস্সানি নারিয়ো সমলংকতা ।

১০। আশ্রববিহীন, বীতরাগ, শাস্তচিহ্ন, সমাহিত অনেক শত ভিক্ষু—
 সকলে সতত আমাকে ঘিরে থাকে ।

[আসব—ওষ=কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব, অবিজ্ঞাসব.....ক্ষ=প্রাণা,
 আ—ক্ষ+অল=আশ্রব, বিষয়ের প্রতি মনের একটা সরস ভাব, সেটা
 আশ্রব।]

১১। যারা অর্হন্তফল প্রাপ্ত হয়নি এবং যারা শিক্ষাব্রতী তারা যদি
 মনুষ্য জন্ম ত্যাগ করে, তবে সে সকল ভিক্ষু ভিক্ষুদের প্রশংসাই নয় ।

১২। আষ্টাঙ্গিক মার্গের স্তুতিকারী সর্বদা ধর্মরত ব্যক্তিগণ এবং সংসার-
 সাগরে স্থিত স্মৃতিমান নরগণ আর্হস্যতা বুঝতে পারবেন ।

১৩। কপিলবস্ত্র নগরে আমার পিতা সুদ্ধোদন এবং আমার জনয়িত্রী
 মাতা মায়্যা দেবী নামে অভিহিতা ।

১৪। আমার বাড়ীতে আমি ঊনত্রিংশ বৎসর পর্যন্ত বাস করেছিলাম ;
 রাম, সুরাম এবং শুভক নামে তিনটি উত্তম প্রাসাদ ছিল ।

(১) রম্য, সুরম্য, এবং সুভত—নবভূমক—সপ্তভূমক—পঞ্চভূমক ।

ভদ্রকচ্চা নাম নারী রাহুলো নাম অত্রজ ॥ ১৫
 নিমিত্তে চতুরো দিশ্বা অস্‌সযানেন নিক্‌খমিম্ ।
 ছব্বস্‌সং পধানচারং অচরি ত্বক্করম্ অহং ॥ ১৬
 বারাগসী ইসিপত্তনে চক্কং পবত্তিতং ময়া ।
 অহং গোতমসংবুদ্ধো সরণং সৰ্ব্বপাণিনম্ ॥ ১৭
 কোলিতো উপতিস্‌সো চ হে ভিক্‌খু অগ্রসাবকা ।
 আনন্দো নাম উপথাকো সন্তিকাবচরো মম ॥ ১৮
 থেমা উপ্পলবণ্ণা চ ভিক্‌খুনী অগ্রগ্‌গসাবিকা ।
 চিত্তো চ হত্থালবকো অগ্গপট্টাকুপাসকা ॥ ১৯
 নন্দমাতা চ উত্তরা অগ্গপট্টিকুপাসিকা ।

১৫। চল্লিশ সহস্র নর্তকী নারী কত্‌কং সমলংকৃতা ভদ্রকচ্চা নামে নারী (পত্নী) ; এবং রাহুল নামে আত্মজ ।

(২) নাটকিখিরো = নর্তকী জীগণ ।

১৬। চারিটি নিমিত্ত দর্শন করে আমি ত্বক্কর চৰ্খা আচরণ করেছিলাম ।

১৭। বারাগসী ইসিপত্তনে আমাকত্‌ক ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছিল ।
 আমি সর্বপ্রাণীর শরণ গোতম সংবুদ্ধ ।

১৮। কোলিত ও উপতিস্‌স এই দুইজন ভিক্ষু অগ্রসাবক (প্রধান শিষ্য) ;
 আনন্দ নামে উপস্থায়ক (Personal Assistant) আমার সমীপে নিরন্তর
 অবস্থান করেন ।

১৯। থেমা ও উপ্পলবণ্ণ এই দুইজন আমার অগ্রসাবিকা বা অগ্রশিষ্যা
 (শ্রেষ্ঠা শিষ্যা) ; চিত্ত এবং হত্থালবক এই দুইজন অগ্র-উপস্থায়ক—উপাসক
 প্রধান সেবক—উপাসক বা গৃহী উপাসক ॥

গৌতম-বুদ্ধ-বংসো

৭৯

অহং অসুখমূলংহি পত্তো সংবোধিম্ উত্তমম্ ॥ ২০

ব্যামপ্পভা সদা ময়্ হং সোলসহস্সমুগ্গতো ।

অপ.পং বস্সসতং আয়ু ইদান এতরহি বিজ্জতি ॥ ২১

তাবতা তিট্ঠমানোইহং তারেমি জনতং বহুং ।

ঠপয়িহান ধম্মোদ্ধং পচ্চিমজনবোধনং ॥ ২২

অহং পি ন চিরস্সেব সদ্ধিং সাবকসঙ্ঘতো ।

ইথেব পরিনিবিবস্সং অগ্গিগবাহারসংখয়া ॥ ২৩

তানি চ অতুলতেজানি ইমানি চ দসবলানি ।

অয়ঞ্চ গুণধরবরদেহো দ্বত্তিৎসলকুখণাচিতো ॥ ২৪

অসদিসা পভাসেহা সতরংসীব ছপ্পভা ।

সববা সমন্তুরহেস্সসন্তি নহু রিদ্ধা সববসংখারাতি ॥ ২৫

গৌতমশ্র ভগবতো বংসো পঞ্চবীসতিমো ।

২০। নন্দমাতা এবং উত্তরা এই দুইজন অগ্রোপস্থায়িকা উপাসিকা অর্থাৎ গৃহস্থ-শিষ্যা ॥ আমি অশুখমূলে উত্তম সংবোধি লাভ করেছি ।

২১। (ব্যাম=চারহাত=একটি পুরুষের আকার) আমার চতুর্দিকে প্রভা ষোড়শ হস্তপরিব্যাপ্ত ॥

এখন আমার আয়ু শত বৎসরের অল্প (অর্থাৎ আশী বৎসর) বিজ্ঞমান ॥

২২। ততকাল বিজ্ঞমান থেকে আমি ভাবি-জনবোধনকারী ধর্মোদ্ধা স্থাপন করত বহু জনতাকে উদ্ধার করবো ।

২৩। আমিও অচিরেই শ্রাবক সঙ্ঘের সহিত ইন্দ্রনক্ষরে অগ্নির ত্রায় (অগ্নিঃ ইব আহা-র-সংক্ষরায়) এইখানেই পরিনির্বাণ লাভ করবো (মৃত্যুর পর নহে) ॥

২৪। ২৫। সেই অতুল তেজ এবং এই দশবল এই যে বজ্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণমণ্ডিত গুণধর বর দেহ ষট্ প্রভ সূর্যের ত্রায় (শতরশ্মি=সূর্য; ষট্ প্রভ=ছয়টি প্রভা) অতুলনীয় প্রভা বিস্তার করে, তা সকলই অন্তর্হিত হইবে। সমস্ত সংস্কার রিদ্ধ নহে কি? (সংস্কার=কার্যকারণজাত পদার্থ)

বুদ্ধ বংশে সপ্তবিংশ অধ্যায়

অপরিমেযে ইতো কপ্পে চতুরো আশ্বং বিনায়ক।

তণ্হক্করো মেধক্করো অথো পি সরণংকরো।

(১) দীপক্করো চ সংবুদ্ধো এককপ্পংহি তে জিনা ॥ ১

দীপক্করস্স অপরেন (২) কোণ্ডঞ্‌ঞস্স নাম নায়কো।

একো ব এককপ্পংহি তারেসি জনতং বহ্ম ॥ ২

দীপক্করস্স ভগবতো কোণ্ডঞ্‌ঞস্স চ সথুনো।

এতেসং অন্তুরা কপ্পা গণনাতো অসংখিয়া ॥ ৩

কোণ্ডঞ্‌ঞস্স অপরেন মঙ্গলো নাম নায়কো।

তেসমপি অন্তুরা কপ্পা গণনাতো অসংখিয়া ॥ ৪

(৩) মঙ্গলো চ (৪) স্ত্রমনো চ (৫) রেবতো (৬) শোভিতো
মুনি।

তে পি বুদ্ধা এককপ্পে চক্কুমন্তো পভক্করা ॥ ৫

১। বর্তমান সময় থেকে বহু বহু কল্প পূর্বে চারজন বিনায়ক ছিলেন—
তণ্হক্কর, মেধক্কর এবং শরণক্কর ও দীপক্কর—এই চার জন সংবুদ্ধ জিন একই
কল্পে ছিলেন।

২। দীপক্কর বুদ্ধের পরে কোণ্ডজ নামক নায়ক এই কল্পে একাকী বহু
জনতাকে পরিভ্রাণ করেছিলেন।

৩। দীপক্কর ভগবান্ এবং শাস্তা কোণ্ডজের মধ্যে বহুকাল গত হয়েছে।

৪। কোণ্ডজের পরে মঙ্গল নামক নায়ক আসেন ; এই দুইজনের মধ্যবর্তী
সময়ে ও বহু কল্প অতীত হয়ে যায়।

৫। মঙ্গল, স্ত্রমন, রেবত এবং মুনি শোভিত—এই চক্কুমান্ দ্ব্যতিশীল
চারিজন বুদ্ধ একই কল্পে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

সোভিতস্ অপরেন (৭) অনোমদস্জি মহাযসো ।

তেসম্ পি অন্তরা কপ্পা গণনাতো অসংখিয়া ॥৬

অনোমদস্জি (৮) পহুমো (৯) নারদো চাপি নায়কো ।

ভেহপি বুদ্ধা এককপ্পে তমন্তকারকা মুনী ॥ ৭

নারদস্ অপরেন (১০) পহুমোত্তরো নাম নায়কো ।

এককপ্পংহি উপপন্নো তারেসি জনতং বহুম্ ॥ ৮

নারদস্ ভগবতো পহুমন্তরস্ সখুনো ।

তেসম পি অন্তরা কপ্পা গণনাতো অসংখিয়া ॥ ৯

কপ্পসতসহস্ সংহি একো আসী মহামুনি ।

পহুমোত্তরো লোকবিদু আহুতীনং পটিগ্গহো ॥ ১০

তিংসকপ্পসহস্ সংহি ছবে আসিংসু নায়কা ।

(১২) স্মমেধো চ (১২) স্মজাতো চ ওরসো পহুমোত্তরো ॥ ১১

৬। শোভিত বুদ্ধের পরে মহাবিশ্বী অনোমদর্শী জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁদের উভয়ের মধ্যে ও সুদীর্ঘকাল ব্যয়িত হয় ।

৭। অনোমদর্শী, পদ্ম, এবং নায়ক নারদ—এই তিনজন বুদ্ধ মুনি তমঃ ধ্বংস করিবার জন্ত একই কল্পে প্রাচুর্ভূত হন ।

৮। নারদ বুদ্ধের পরে পদ্মোত্তর নামক নায়ক পরবর্তী কোনও কল্পে উৎপন্ন হয়ে বহু জনতাকে মুক্ত করেছিলেন ।

৯। ভগবান্ নারদ ও শাস্তা পদ্মোত্তর—এই উভয়ের মধ্যে গণনায় অসংখ্য কল্পের ব্যবধান ছিল ।

১০। শত সহস্র কল্পে এক মহামুনি পদ্মোত্তর লোকবিদু এবং যজ্ঞাহুতির গ্রাহক অর্থাৎ দক্ষিণা হইলেন ।

১১। ত্রিশ সহস্র কল্পে দুজন নায়ক ছিলেন—স্মমেধ এবং স্মজাত—তাঁরা পদ্মোত্তরের পরস্পরাগত ।

অট্ঠারসে ইতো কপ্পসতে তয়ো আসিংসু নায়কা ।

(১৩) প্রিয়দঙ্গী (১৪) অর্থদঙ্গী (১৫) ধর্মদঙ্গী চ নায়কা ॥১২

ওরসো চ সূজাতস্ সংবুদ্ধা দ্বিপহুত্তমা ।

এককল্লংহি সংবুদ্ধা লোকে অপ্পটিপুগ্গলা ॥১৩

চতুনবুতে ইতো কপ্পে একো আনৌ মহামুনি ।

(১৬) সিদ্ধখো সো লোকবিদু সল্লগত্তো অহুত্তরো ॥১৪

ধে নবুতে ইতো কপ্পে দুবে আসিংসু নায়কা ।

(১৭) তিস্সো (১৮) ফুস্সো চ সংবুদ্ধা অসমা অপ্পটিপুগ্গলা ॥১৫

একনবুতে ইতো কপ্পে (১৯) বিপঙ্গী নাম নায়কো ।

সোপি বুদ্ধো কারুণিকো সত্তে মোচেসি বন্ধনা ॥১৬

১২ । এই সময় থেকে ১৮০০ শত কল্পে তিনজন নায়ক ছিলেন—প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ও ধর্মদর্শী ।

১৩ । সূজাতের পরম্পরায় বুদ্ধগণ অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিনজন বুদ্ধ—যথা, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ও ধর্মদর্শী একই কল্পে জগতে অপ্রতিপুঙ্গল অর্থাৎ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ সংবুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ।

১৪ । এখন থেকে ২৪ কল্পে একজন মহামুনি ছিলেন—তিনি সিদ্ধার্থ—যিনি দুঃখশল্যের উৎপাটনকারী শ্রেষ্ঠ লোকবিদু ॥

১৫ । এখন থেকে ২২ কল্পে তিস্স ও ফুস্স নামক দুইজন অল্পম অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সংবুদ্ধ নায়ক ছিলেন ।

১৬ । এখন থেকে ২১ কল্পে বিপঙ্গী নামক নায়ক ছিলেন—তিনি কল্পাপরায়ণ বুদ্ধ—বন্ধন থেকে সত্ত্বগণকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন ।

একতিংসে ইতো কপ্পে ছবে আসিংগু নায়ক।

(ক) সিখী চ (২১) বেস্সভু চ এব অসমা অপ্পটিপুগ্গলা ॥১৭

ইমংহি ভদ্রকে কপ্পে তয়ো আসিংগু নায়ক।

(২২) ককুসঙ্কো (২৬) কোণাগমনো (২৪) কস্সপো চাপি

নায়কো ॥১৮

অহম্ এতরহি (২৫) সংবুদ্ধো (২৫) মেত্তেয়ো চাপি হেস্সতি ।

এতে পিমে পঞ্চবুদ্ধা ধীরা লোকানুকম্পকা ॥১৯

এতেসং ধর্মরাজুনাং অঞ্ঞেংসং নেককোটিনম্ ।

আচিক্খিহান তং মগ্গং নিববুতা তে সসাবকা তি ॥২০

বুদ্ধপকিন্নকথং নিট্ঠিতম্ ॥

১৭। এখন থেকে একত্রিশ কল্পে দুইজন নায়ক ছিলেন—সিখি (শিখী) এবং বেস্সভু—তারাও অতুলনীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন।

১৮। এই ভদ্রককল্পে তিনজন নায়ক ছিলেন—ককুসঙ্ক, কোণাগমন এবং কস্সপ (কস্তপ) ॥

১৯। এখন আমি সংবুদ্ধ হয়েছি ; মৈত্রেয় ও পরে হবেন। এই পাঁচজন বুদ্ধ ধীর এবং লোকের প্রতি (অত্যন্ত) করুণাপরবশ।

২০। এই সকল ধর্মরাজগণকে এবং অগ্রান্ত অনেক কোটি লোককে সেই (নির্বাণ) মার্গ উপদেশ দিয়ে তাঁরা শ্রাবকগণের সঙ্গে নির্বৃত্তি লাভ করেছেন ॥

বুদ্ধপ্রকৌর্গক থণ্ড

সমাপ্ত ॥

বুদ্ধবংশের আটশ সর্গ ॥

২৮। বুদ্ধদেবের ধাতুবিভাগ।

মহাগোতমো জিনবরো কুসিনারামংহি নিব্বুতো।

ধাতুবিখারিকমাসি তেসু তেসু পদেসতো তি ॥১

একো অজাতসখুসুস, একো বেসালিয়া পুরে।

একো কপিলবথুংহি, একো চ অল্লকপ্পকে ॥২

একো চ রামগামংহি, একো চ বেঠদীপকে।

একো চ পাবেয়্যকে মল্লে, একো চ কুসীনারকে ॥৩

কুন্তসুস থুপং কারেসি ব্রাহ্মণো দোণসব্হযো।

অঙ্গারথুপং কারেসুং মোরিয়া তুট্ঠমানসা ॥৪

১। জিনবর মহাগোতম কুসীনারায় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই সেই প্রদেশে অর্থাৎ বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রদেশে তাঁর ধাতু বিস্তার লাভ করেছিল অর্থাৎ তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে তত্রত্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এসে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২। [(দাঁটা অর্থাৎ সন্মুখের দন্ত-ব্যতীত) শরীরের সমস্ত ধাতু আট ভাগে ভাগ করা হয়।] [তন্মধ্য থেকে]

এক অংশ রাজা অজাতশত্রুর রাজ্যে, আর এক অংশ বৈশালাতে, এক অংশ কপিলবাস্তুতে এবং আর এক অংশ অল্লকপ্পকে [নীত হয়।]

৩। এক অংশ রামগ্রামে, এক অংশ বেঠদীপকে, এক অংশ পাবাবানী মল্লদের দেশে, এবং এক অংশ কুসীনারায় ॥

৪। দ্রোণ-নামক ব্রাহ্মণ কুন্তসুপ করেছিলেন; সন্তুষ্টচিত্ত মোর্ষেরা অঙ্গার-সুপ করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের খাড়াবিভাগ

৮৫

অট্ট সারীরিকা খুপা, নবমো কুম্ভচেতিয়ো ।
 অঙ্কারখুপো দসমো ভদা এব পতিট্ঠিত্তো ॥৫
 একা দাঠা তিদ্দসপুৱে, একা নাগপুৱে অহু ।
 একা গঙ্কারবিসয়ে, একা কালিঙ্গরাজিনো ॥৬
 চত্তালীসসমাদন্তা কেসা লোমা চ সববসো ।
 দেবা হরিংসু একেকং চক্কবালপরংপর। ॥৭
 বজ্জিরায়ং ভগবতো পন্তো দণ্ডঞ্চ চীবরম্ ।
 নিবাসনং কুসঘরে পচ্চথরণং কপিলহবয়ে ॥৮
 পাটলিপুত্তনগরে করকং কায়বন্ধনং ।
 চম্পায়মুদক-সাটিকা উর্ললোমঞ্চ কোসলে ॥৯

৫। আটটি শারীরিক স্তূপ, নবম কুম্ভচেত্য, দশম অঙ্কার-স্তূপ সেই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৬। একটি দন্ত স্বর্গে, এক দন্ত নাগপুর বা পাতালে একটি দন্ত গাঙ্কার দেশে এবং অষ্টটি কলিঙ্গরাজ্যের দেশে।

৭। চল্লিশটি দাঁতের অবশিষ্ট দাঁত সকল কেশ এবং লোম দেবতারা হরণ করে দিগ্‌দিগন্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৮। ভগবানের ভিক্ষা পাত্র দণ্ড এবং চীবর বজ্জিরায় নীত হয়েছিল এবং কুশঘরে অন্তর্বাস বা নিবাসন ও কপিল নগরে বিছানার চাদর নীত হয়েছিল।

৯। পাটলিপুত্র নগরে কায়-বন্ধন, করক এবং চম্পানগরে স্নানবস্ত্র এবং কোশলে উর্ললোম।

কাশাবধ ব্রহ্মলোকে বেঠনং তিদসে পুরে ।
 পানাগকে পদং সেট্ঠং যথাপি অচুতিপদং
 নিসীদনমবন্তিপুৱে রট্ঠে [অ]থরং তদা ॥ ১০
 অরগী চ মিথিলায়ং বেদেহি পরিসাবনং ।
 বাসিসুচিঘরথাপি ইন্দরট্ঠে পুরে তদা ॥ ১১
 পরিক্খারং অবসেসং জনপদে অপরন্তকে ।
 পরিভুত্তানি মুনিনা অকংসু মনুজা তদা ॥ ১২
 ধাতুবিখারিকমাসী গোতমস্ম মহেসিনো ।
 পাণিগমনুকম্পায় অহু পোরাণিকো তদা তি ॥ ১৩

ধাতুভাজনিয়কথা নিট্ঠিতা

বুদ্ধবংশো নিট্ঠিতো

১০। ব্রহ্মলোকে কাশাববজ্র, ত্রিদশপুরে দেহ বেঠন (বা দেহ-বেঠনী)
 এবং ভগবানের শ্রেষ্ঠ পদ যা' হচ্ছে অচ্যুতপদ—তা' পাষণকে গেল ।

তখন অবন্তীপুর রাষ্ট্রে বনবার আসন এবং তার আন্তরণ (ওয়ার)
 নীত হল ।

১১। অরগি গেল মিথিলায়; বিদেহে জলের ছাঁকনি; ক্ষুর এবং
 সুচিভাজন বা সুচিপাত্র (সুঁচের আধার) তখন ইন্দ্রপ্রস্থ রাষ্ট্রে গেল ।

১২। অপরান্তক বা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবশিষ্ট ব্যবহার্য বস্তু ।
 মুনিকর্তৃক পরিভুক্ত সব কিছুই তখন মানুষেরা বিভাগ করে নিয়েছিল ।

১৩। মহর্ষি গোতমের ধাতু বিভাগ প্রাণিগণের প্রতি অহুকম্পাবশতঃ
 তখন হয়েছিল—একথা পৌরাণিকেরা বলে গেছেন ।

ধাতুবিভাগকথা সম্পূর্ণ ।

বুদ্ধবংশ সমাপ্ত ॥

বুদ্ধদেবের ধাতুবিভাগ

৮২

বুদ্ধবংশের কোন কোনও পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলি
পাওয়া যায়—

রেবতো সোভিতো বুদ্ধো পহ্মো দ্বিপদন্তমো
সুমেধো অথদসসী চ ফুসসো চ বেসসন্তু জিনো
কোণাগমনো গোতমো নবন্নং ধাতু বিখতা
সোলসন্নমবিখারা তে পি বন্দামি ধাতুরো
সহসসদ্বিসতা গাথা চতুসট্ঠি চ পিণ্ডতো
পধানমাদিপেয়্যালা নিমুগ্গা দস গাথকা
অহু কপ্পিলপেয়্যালা নিমুগ্গা পন চুদস ॥

রেবত, শোভিত, দ্বিপদোত্তম পদ, সুমেধ, অথদসিস, ফুস ও বেসসন্তু
কোণাগমন, গোতম—এই নয়জনের ধাতু বিভক্ত হয়েছিল।

অন্য ষোলজনের ধাতুবিভাগ হয়নি; সেই ধাতুসমূহকে আমি
বন্দনা করি।

১২৬৪টি গাথার এখানে সমন্বয় হয়েছে অর্থাৎ বুদ্ধবংশে ১২৬৪টি গাথা
আছে। দশমী গাথা প্রধানাদিতে পূর্ববৎ—এই উক্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট
আছে; আর ১৪টি গাথা কপ্পিল পর্যায়ে নিম্ন আছে।

ত্রিপিটক

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ত্রিপিটক গ্রন্থ সম্যক্ সংবুদ্ধ ভগবান্ তথাগতের বাণীসম্ভার সংবলিত অমূল্য রত্ন। এই ত্রিপিটক তিনভাগে বিভক্ত—(১) বিনয়, (২) সূত্র, (৩) অভিধর্ম। প্রত্যেক ভাগেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ বিদ্যমান। যেমন বিনয় পিটকে (১) পারাজিক, (২) পাচিভিয়, (৩) মহাবগ্গো, (৪) চুলবগ্গো এবং (৫) পরিবারপাঠো। সূত্রপিটকে রয়েছে—(১) দীঘনিকায়ো (২) মজ্জিম নিকায়ো, (৩) সংযুতনিকায়ো, (৪) অঙ্গুত্তরনিকায়ো এবং (৫) খুদ্দকনিকায়ো। এই শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ (ক) খুদ্দকপাঠো; (খ) ধর্মপদং (গ) উদানং, (ঘ) ইতি—বৃত্তকং, (ঙ) সূত্ৰনিপাতো, (চ) বিমান বথু। (ছ) পেতবথু; (জ) থেরগাথা; (ঝ) থেরীগাথা; (ঞ) জাতকং (ট) চুলনিদ্দেশো; (ঠ) মহানিদ্দেশো; (ড) অপাদানং (ঢ) বুদ্ধবংসো (ণ) চরিয়্য পিটকং (ত) পটিনংভিদামগ্গো গ্রন্থের সমাহার-এবং অভিধর্ম-পিটকে (১) ধর্মসঙ্ঘনি, (২) বিভঙ্গো, (৩) কথাবথু; (৪) ধাতুকথা; (৫) পুগ্গলপ্ৰতি; (৬) যমকং এবং (৭) পট্ঠানং—এই গ্রন্থসম্প্রদায় বিদ্যমান।

ভারতবর্ষের গ্রন্থরাশির একটা আশ্চর্য্য দিক্ এই যে এইগুলি যেমন একদিকে বিষয় বস্তুর গরিমায় থাকে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর, তেমনি আকারেও প্রায়ই লক্ষ বা লক্ষাধিক শ্লোক বা শ্লোকপরিমিত সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। যেমন—(১) বৃহৎ কথা—গল্পের শিরোমণি গ্রন্থ; (২) মহাভারত—লক্ষ শ্লোকায়ত্নক; (৩) প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র—লক্ষশ্লোকায়ত্নক, সপাদলক্ষশ্লোকায়ত্নক (অবশ্য ক্ষুদ্রাকৃতিও আছে) ইত্যাদি। জ্ঞানচর্চার এই অপূর্ণ দিকের কথা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য্য হতে হয়। ত্রিপিটকের আকার সম্বন্ধেও ধারণা

করতে হলে শ্রামদেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত ত্রিপিটকের পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থ রয়েল সাইজের কাগজে মুদ্রিত—৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খণ্ডে গড়ে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। বিনয় পিটকের ৮ খণ্ডে ৩২৭২ পৃষ্ঠা, অভিধর্মের ১২ খণ্ডে ৫৪৭২ পৃষ্ঠা এবং সূত্রপিটকের ২৫ খণ্ডে ১১১৩৬ পৃষ্ঠা—মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮৮০ পৃষ্ঠা। আর একটি উপায়েও এই গ্রন্থের পরিমাণ বিবেচনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থে মোট ৮৪০০০ চুরাশী হাজার সূত্র। এই সূত্র কিন্তু পাণিনির বা গৃহসূত্রের মত সূত্র বা স্মরণার্থক রচিত সামান্ত কতিপয় শব্দের সমাহার নয়—এখানে সূত্র অর্থ এক একটা পাঠ (বা Discourse)—সূত্র বা বৃহৎ সর্ব প্রকারের। কি অক্ষরন্ত সাধনালঙ্কার ও স্বতউন্মেষিত জ্ঞানের ফল এই ত্রিপিটক—এথেকেই সহজে অনুমান করা চলে।

ভগবান্ বুদ্ধ গয়াধামের উল্লেবেলায় ছয় বৎসর সাধনার পর বোধিবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সম্যক্ সংবোধ বা সর্বজ্ঞতা লাভ করলে। ৩৫ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে কাশীর ঋষিপত্তন যুগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করে তাঁর লব্ধ সত্য সর্বপ্রথম প্রচার করেন। তারপর ৮০ বৎসর পর্যন্ত ৪৫ বৎসরকাল ধরে আর্ষাবর্তের নানা স্থানে শিষ্যগণের সঙ্গে ভ্রমণ করে ধর্মপ্রচারপূর্বক তিনি এই সঙ্ঘ ভারতে সুপ্রতিষ্ঠ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় ৮০ বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণের পূর্ব সময় পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্থানে ও বিহারে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ও পূর্ববৃত্তান্ত ত্রিপিটক গ্রন্থে সংরক্ষিত হয়েছে।

ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অত্যন্ত সময়ের মধ্যে রাজগৃহে অজাতশত্রুর শাসনকালে স্থবির মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে ৫০০ অর্হং ভিক্ষু প্রথম সঙ্ঘীতিতে এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম সংগৃহীত করেন। তারপর ১০০ এক শত বৎসর পরে রাজা কালাশোকের সহায়তায় বৈশালীতে ৭০০ ভিক্ষু সমবেত হয়ে দ্বিতীয় সঙ্ঘীতিতে ত্রিপিটক আবৃত্তি করেন।

ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৬তম বর্ষে সম্রাট অশোকের সময়ে ষাটহাজার ভিক্ষু থেকে নির্বাচিত ১০০০ এক হাজার ভিক্ষু পার্টলীপুত্রের অশোকারামে মোদগলীপুত্র তিস্ত্র স্ববিরের সভাপতিত্বে তৃতীয় সঙ্গীতিতে সমবেত হন। এই সঙ্গীতিতে বিভিন্নবাদাবলম্বী তীর্থিক কঠক প্রক্ষিপ্ত অবাস্তিত ও অবাস্তুর আচারগুলিকে পরিত্যাগ করে ত্রিপিটকের পরিশোধন করা হয়। এই পরিশোধিত ত্রিপিটকই অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে নিয়ে যান এবং সেখানে তত্ত্ব্য রাজা দেবপ্রিয় তিস্ত্রের সহায়তায় তা' প্রচার করেন। এই ত্রিপিটকই সম্প্রতি সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্রামদেশে প্রচলিত।

ত্রিপিটক শাস্ত্র কোনও সম্প্রদায় বিশেষের সম্পদ নয়। এ গ্রন্থ ভারতবাসী মাত্রেরই অমূল্য সম্পদ। ত্রিপিটক প্রচার করেছেন আর্য সত্য, সনাতন নীতি এবং সার্বজনীন বাণী। দ্বিহস্ত পাঁচশত বৎসর পূর্বের ভারতের সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজনীতি প্রভৃতির বথ্যথ বিবরণ এই গ্রন্থে অবিকলভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কোনও প্রকার প্রাপ্তি বিষয়ের অমরবাদার করাল কবল থেকে একে রক্ষা করার এত নিরন্তর প্রাণপণ প্রযত্ন অব্যাহত ছিল যে এতে সত্যের কোনও প্রকার বিকৃতি স্থান পায়নি।

বিনয় পিটক

বিনয়-পিটকের মৌলিক প্রারম্ভ পাতিমোক্খ বলে মনে হয়। ভিক্ষুকের কোনও পাপ হলে, নিয়ম-বিচ্যুতি ঘটলে তার জন্ত প্রারম্ভিত বিহিত; তাই এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ আছে। পাতিমোক্খের জন্তই জীবন বিশুদ্ধি, শুদ্ধ-জীবনধৃতি, একথা দীঘনিকায় (২:৪২; ১৩:৪২; ২৬:২৮) বলেছেন (পাতিমোক্খ সংবর সংবৃত্তো) ॥ মজ্জিমনিকায় (১০৮) আনন্দ

বিনয় পিটক

২১

বলেছেন যে ভগবান্ বুদ্ধ দশ-আদেশ (Ten Commandments) সংবলিত যে শিক্ষাপদ এবং পাতিমোক্খ ভিক্ষুদের জন্ত রেখে গেছেন, তার দ্বারাই সংঘ আপন গতিপথে উত্তরোত্তর চলতে থাকবে। এই পাতিমোক্খ প্রতি মাসে অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুদের উচ্চারণ করে তার সঙ্গে কৃত কর্ম যাচাই করে দেখতে হতো—কোথাও ভুল ত্রুটি ঘটেছে কি না। যদি ঘটে থাকে, ভিক্ষুকে সে ত্রুটি স্বীকার করতে হবে—এ ত্রুতের নাম ছিল উপোষথ। এ পাতিমোক্খে প্রারম্ভের দিকে ১৫২টি নিয়ম ছিল; কিন্তু খেরবাদীদের বিনয়পিটক বিরচনের সময় তার সংখ্যা ২২৭শে উন্নীত হয়।

বর্তমানে যে স্তম্ভবিভঙ্গ গ্রন্থ পাতিমোক্খস্ত্রের টীকারূপে দৃষ্ট হয়, তাতেই পাতিমোক্খস্ত্র অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। এই স্তম্ভবিভঙ্গের দুটি অংশ—মহাবিভঙ্গ এবং ভিক্ষুণীবিভঙ্গ। পাতিমোক্খ দৃষ্টে ভিক্ষুণীবিভঙ্গ পরবর্তী সময়ে রচিত হয়।

এই স্তম্ভবিভঙ্গেরই অনুবর্তনরূপে পরিদৃষ্ট হয়—খন্ডক—সমূহ। মহাবগ্গে আছে দশস্কন্ধ যথা (১) মহাস্কন্ধ; (২) উপোষথস্কন্ধ; (৩) বর্ষোপনায়কস্কন্ধ; (৪) প্রবারণাস্কন্ধ; (৫) চর্যস্কন্ধ (৬) ভৈষজ্যস্কন্ধ; (৭) কঠিনস্কন্ধ; (৮) চীবর-স্কন্ধ; (৯) চম্পেয়্যস্কন্ধ ও (১০) কৌশাঘীস্কন্ধ ॥ এই সকল স্কন্ধে সজ্জ্ব প্রবিষ্ট হওয়ার আইনকানুন, উপোষথের নিয়মাবলী, বর্ষাবাস এবং বর্ষান্তে অনুষ্ঠেয়পবারণা; পাতুকা, যান-আসন-গ্রহণাদি, ঔষধ, বস্ত্র, সজ্জ্বর অন্তর্বর্তী নিয়ামক বিধান—অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

চুল্লবগ্গের প্রথম নয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত, তপস্শ্রা, বিসংবাদ নিরসন, ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবন, বাসভবন এবং তার সজ্জীকরণ, ভিক্ষুদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশার পদ্ধতি এবং পাতিমোক্খ থেকে বিরতি বিষয়ে উল্লেখ আছে। চুল্লবগ্গের দশম স্কন্ধে ভিক্ষুণীদের প্রসঙ্গ। খন্ডকার মধ্যে “কম্বাচা” সমূহ রয়েছে অন্তর্নিহিত—এই কম্বাচাগুলি অনেকটা বৈদিক মন্ত্রের মত—এবং

এগুলি খুব প্রাচীন। চুল্লবগ্গে দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রাজগৃহ এবং বেসালি ধর্মসভাঘরের বিবরণ।

বিনয় পিটকের সব বগ্গ, সকল অংশ ভগবান্ বুদ্ধের উক্তি—এবং অপূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত। সমস্ত বিধি-নিষেধ ঘটনা পরস্পরার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এর সঙ্গে একটি বিশেষ উপভোগ্য সাহিত্য-শোভাও করেছে আত্মপ্রকাশ। প্রথমতঃ ভগবান্ বুদ্ধ কোন্ অবস্থায় কাকে কখন কিসের জন্ত এইসব উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকেই একটি ভক্তিঘন রূপরস ফুটে উঠে। উদাহরণক্রমে বলা যায়—মহাবগ্গের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই কি করে ভগবান্ বুদ্ধ কাশীর ইসিপণ্ডন মুগদাবে সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। এই প্রসঙ্গে বিনয়পিটকে বলা আছে যে ভগবান্ বুদ্ধ চিন্তা করলেন—আমি সর্বপ্রথম কার কাছে ধর্মপ্রচার করবো, কে বা তা' বুঝতে পারবে? আরাড় কালাম, রুদ্রক রামপুত্র—উভয়ের কথা মনে হলো। কিন্তু উভয়েই মৃত। তখন ভগবান্ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের কথা স্মরণ করলেন। এবং বারাণসীতে স্বয়ং গমনপূর্বক ঋষিপুত্র মুগদাবে সর্বপ্রথম ধর্ম প্রবর্তন করলেন। আত্মবিক উপককে বললেন—

অহং হি অরহা লোকে, অহং সখা অহুত্তরো।

একোম্হি সম্মাসবুদ্ধো সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো।

ধম্মচক্কং পবন্তেতুং গচ্ছামি কাসিনং পুরং

অদ্ধভূতস্মিং লোকস্মিং অহঞ্ঞাং অমতহুন্মুভিস্তি।

অর্থাৎ আমি অদ্ধবিশ্বে নিরন্তর অমৃতহুন্মুভি বাজিয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তনের নিমিত্ত চলেছি কাশীধামে। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুবর্গকে কাশীতে তিনি বললেন—“যে মে ভিক্ষুবে, অস্তা পক্ষাজিতেন ন সেবিতব্বা। যো চান্নং কামেন্ন কামসুখল্লিকান্ন-যোগো হীনো গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিয়ো অনথনংহিতো,...(১) এতে খো ভিক্ষুবে, উভো অন্তে অহুপগম্ম মজ্জিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসংবুদ্ধা”। অর্থাৎ ‘হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিত এই দুই বিষয়ের অন্ত অহুশীলন করবে না;

প্রথম, কামত্বখোদ্যের প্রতি অল্পরক্তি, যা' হীন, গ্রাম্য, ইতর-সাধারণের সেব্য, অনার্থজনোচিত ও অনর্থযুক্ত; দ্বিতীয়, আত্মনিগ্রহে অল্পরক্তি, যা হুঃখদায়ক, অল্পংকষ্ট ও অনর্থযুক্ত।...হে ভিক্ষুগণ! এই দুই অন্তের অল্পগামী না হয়ে তথাগত মধ্যম প্রতিপদ বা মধ্যপন্থায় অভিসংবোধি করেছেন লাভ।" এবং এই মধ্য পন্থা অল্পসরণের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ,—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আত্মীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। ভগবান্ এও তাঁদের বল্লেন যে এই মধ্যম প্রতিপদ চক্ষুরণী, জ্ঞানকরণী এবং এপথ উপশম, অভিজ্ঞতা, সংবোধি এবং নির্বাণ অভিমুখে প্রবর্তিত করে। তিনি আরো বল্লেন—

“হে ভিক্ষুগণ! জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্ৰিয়সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ এবং ঈপ্সিত বস্তুর অপ্ৰাপ্তি হুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্বদ্ধই হুঃখ। এই হুঃখ আর্যসত্য। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা—এগুলি হুঃখ সমুদায় বা হুঃখের কারণ। যা' নিঃশেষে এই সকল তৃষ্ণার বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও বিনর্জনপূর্বক অনালয় মুক্তি দান করে, সে সত্যটী হুঃখনিরোধ আর্যসত্য। এবং পূর্বোক্ত আর্ষাষ্টাঙ্গিক মার্গই হুঃখনিরোধকারী প্রতিপদ আর্যসত্য। এই চারিটি আর্য সত্যে ত্রিপর্যবর্ত। সত্যজ্ঞান, কৃত্যজ্ঞান ও কৃতজ্ঞান দ্বারা দ্বাদশাকার-বিশিষ্ট ষথার্থ জ্ঞান বিশুদ্ধ হয়, তখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না।” এই প্রকারের কত সুন্দর বৃত্তান্ত, উপদেশ প্রভৃতি এই বিনয়-পিটকের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই।

স্মৃত্ত-পিটক

(১) দীঘ-নিকায়।

এই নিকায়ের বা বচন সংগ্রহে তিনটি বগ্গঃ—

(ক) সীলকুথক—বগ্গঃ.....১৩ স্মৃত্ত

(খ) মহাবগ্গ.....১০ ”

(গ) পাতিক—বগ্গঃ.....১১ ”

৩৪ স্মৃত্ত

(ক) সীলকুথক—বগ্গঃ

১। ব্রহ্মজাল-স্মৃত্ত (১)। এই স্মৃত্তে ভগবান্ বুদ্ধের সময়ের অত্যাশ্রয় ধর্মী-চার্যগণের প্রচারিত জীব-জগৎ সম্বন্ধে ৬২টি বিরুদ্ধমত খণ্ডিত হয়েছে। ব্রহ্মজাল শ্রেষ্ঠ জাল—যাতে অত্যাশ্রয় মত ধরা পড়ে যায়।

২। সাম্যএ-ফল-স্মৃত্ত (২)। গৃহস্থীনের জীবনের ফল। ভগবান্ বুদ্ধ এই স্মৃত্তে রাজা অজাতাত্মকে সম্বোধন যোগদান এবং সংসার ত্যাগের শুভপ্রদ ফল বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন।

৩। অশ্বট্টক-স্মৃত্ত (৩)। অশ্বট্টকের সঙ্গে ভগবান্ বুদ্ধের বর্ণপ্রথা বিষয়ক আলোচনা। শাক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ওকাক সম্বন্ধে উক্তি। বংশগত অভিমান ও অহঙ্কারের পতন নির্দেশ।

৪। সোণদণ্ড-স্মৃত্ত (৪)। সত্যিকার ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডের সঙ্গে কথোপকথন।

৫। কুটদন্ত-স্মৃত্ত (৫)। কুটদন্ত নামক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পশুবাগের নিন্দা-মূলক কথোপকথন।

৬। মহালি-স্মৃত্ত (৬)। মহালির সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্তি বিষয়ক কথোপকথন।

৭। জালিয়-সুত্ত (৭) শরীর ও প্রাণের স্বরূপ বিষয়ক পর্যালোচনা।

৮। কসমপসীহনাদ-সুত্ত। (৮)। নগ্ন সন্ন্যাসী কষ্টপের সঙ্গে আত্ম-নিগ্রহের বিরুদ্ধে কথোপকথন।

৯। পোঠ্ঠপাদ-সুত্ত (৯) পোঠ্ঠপাদের সঙ্গে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা। এখানে ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন যে নির্বাণের দিক থেকে আত্ম-বিষয়ক আলোচনা নিশ্চয়োজন এবং নিষ্ফল।

১০। সুত্ত-সুত্ত (১০)। নীতি, অভিনিবেশ ও জ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ।

১১। কেবট্ট-সুত্ত (কৈবর্ত-সুত্ত) (১১) এখানে ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে ঋদ্ধি প্রদর্শন অপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ করেছেন। এটা তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

১২। লোহিচ্চ-সুত্ত (১২)। শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে লোহিচ্চের সঙ্গে কথোপকথন।

১৩। তেবিচ্ছ-সুত্ত (১৩)। ব্রহ্ম সাযুজ্যের নিমিত্ত বৈদিক জ্ঞানের বৈষম্য প্রদর্শন।

ব্রহ্মজালঞ্চ সালঙ্গ্ণ অষ্ট্ঠং সোমদণ্ডকং।

কুটদন্তঞ্চ মহালি জালিয়ং সীহনাদকং।

পোঠ্ঠপাদেং নথা সুভমানণবো কেবট্টো পিচ।

লোহিচ্ছো তেবিচ্ছো চে'তি ইধ সুত্তানি তেরসাপতি ॥

(থ) মহাবগ্গ

১৪। মহাপদানসুত্ত (১৪)। ভগবান্ বুদ্ধ গৌতম এবং তাঁর পূর্ববর্তী ছয়জন বুদ্ধের লীলাপ্রপঞ্চ। বুদ্ধ বিপ্লবিস সম্পর্কিত আলোচনা। তুসিত স্বর্গ থেকে ভগবান্ বুদ্ধের নবজন্ম পরিগ্রহ।

১৫। মহানিদানসুত্ৰ (১)। প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং আত্মতত্ত্ব; বিঞ্-
ঞানঠিত্তিয়ো ও আৰ্হপ্রকার বিমোক্ষ; জন্ম-মৃত্যু জরা ব্যাধি বিষয়ক
আলোচনা। এই সূত্রেই প্রতীত্যসমুৎপাদের বিশিষ্ট পর্যালোচনা আছে।

১৬। মহাপরিনির্বাণসুত্ৰ (১৬)। ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের
পূর্ববর্তী ও তৎকালীন ঘটনার প্রকৃষ্ট বিবরণ ॥ সৰ্বদিক থেকে এই সুত্ত অত্যন্ত
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এতে ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম শারীরিক
ব্যাধি, সংজ্ঞের নেতৃস্থান গ্রহণ বিষয়ে স্বকীয় অস্বীকৃতি, তাঁর জীবনের শেষ
উক্তি, আনন্দের শোকোচ্ছ্বাস ও বিফলতা, ভগবান্ বুদ্ধের সান্ত্বনাজ্ঞাপন,
সজ্জ পরিচালনবিষয়ক নির্দেশ প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সুত্তে সন্নিবদ্ধ
আছে।

‘তস্মা’তি’হানন্দ অন্তদীপা বিহরথ অন্তসরণা অনঞ্‌ঞসরণা
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্‌ঞসরণা...’

ভগবান্ তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে আহ্বান করে বলেছিলেন—

“হন্দ দানি ভিক্ষবে আমন্তয়ামি বো, বয়ধম্মা সঙ্‌খারা, অল্পমাদেন
সম্পাদেথ, ন চিরং তথাগতস্স পরিনির্বাণং ভবিস্সতি, ইতো তিন্নং মানানং
অচ্চয়েন তথাগতো পরিনির্বাণিস্সত্তীতি।

ইদমবোচ ভগবা, ইদং বহ্বা সুগতো অথাপরং এতদবোচ সথা:—

‘পরিপক্কো বযো ময়ং, পরিজ্ঞং মম জীবিতং।

পহায় বো গমিস্সামি, কতং মে সরণমন্তনো ॥

অল্পমত্তা সতীমন্তো সুশালা হোথ ভিক্ষবো।

সুসমাহিতসংকপ্পা সচিন্তমত্তুরক্কথ ॥

(১) দীকনিকায়ো (দ্বিত্তিমে বিভাগো), Bombay University Publications,
Bombay, 1936, p. 83.

যো ইমস্মিৎ ধম্মবিনয়ে অশ্লমত্তো বিহেস্সতি ।

পহায় জাতিসংসারং দুক্কখস্সন্তং করিস্সতী'তি ।

(ততীয়কং ভাণবারং নিট্ঠিতং)^১

‘সীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুত্তি চ অনুওরা ।

অনুবুদ্ধা ইমে ধম্মা গোতমেন যসস্সিনা

ইতি বুদ্ধো অভিঞ্ঞায় ধম্মমক্খাসি ভিক্খুনং ।

দুক্কখস্স'ন্তকরো সখা চক্খুমা পরিনিব্বুত্তো'তি' ॥^২

ভগবান্ স্বভদ্রকে সংবোধন করে বলেছিলেন—

একুনিতিংনো বয়সা স্বভদ্র ধং পস্সজিৎ কিংকুসলায়ুত্সী ।

বস্সানি পঞ্ঞান সমাধিকানি । যতো অহং পস্সজিতো স্বতদ্ব ।

ঞায়স্স ধম্মস্স পদেসবত্তী । ইতো বহিদ্ধা সমণো'পি নথি ॥

(ঐ, পৃ: ১২ ; ধর্মরত্ন মহাস্থবির সংস্করণ, পৃ: ১৩৮)

১৭। মহাস্বদস্সনস্বত্ত (১৭)।^১ রাজা স্বদস্সন রূপে ভগবান্ বুদ্ধের এক পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত। পরিনির্বাণ সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের উক্তি।

১৮। জনবসত্ত স্বত্ত (১৮)। ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক নাদিকার অধিবাসি-গণের উদ্দেশে যক্ষ জনবসত্তের কাহিনী বর্ণনা। গোতমের বিশ্বাসী উপাসকগণের পুনর্জন্মাদি বিষয়ে আলোচনা।

১৯। মহাগোবিন্দ স্বত্ত (১৯)। মহাবস্তু অবদানে এই স্বত্ত গোবিন্দীয় স্বত্ত নামে পর্যালোচিত হয়েছে। স্বর্গীয় সঙ্গীতজ্ঞ পঞ্চশিখ বুদ্ধের নিকট মহাগোবিন্দের কাহিনী উল্লেখ করছেন; ভগবান্ বলছেন যে তিনি নিজেই মহাগোবিন্দ।

(১) Op. cit, p. 96.

(২) ঐ, পৃ: ২৭.

এই সূত্র থেকে প্রাচীন ভারতের ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ে কিছু সত্যিকার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে কথিত আছে ভারতবর্ষ “শকটমুখ”—এবং ভারতবর্ষ সমান সাত অংশে বিভক্ত ছিল।

২০। মহাসমরসূত্র (২০)। বৌদ্ধধর্ম দেবগণকে অমর বলে স্বীকার করে না। এখানে দৃষ্ট হয় যে কপিলবাস্তুর কুঞ্জে তথাগতকে দেখবার জন্ত তাঁরা সকলে সমবেত হয়েছেন।

২১। সকপঞহসূত্র (২১)। দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধ থেকে জ্ঞানলেন যে যা’ কিছু উৎপন্ন হয়েছে, তা’র বিনাশ অনিবার্য।

২২। মহাসতিপঠান সূত্র (২২)। সতি=স্মৃতি বা জ্ঞান; পট্টান=প্রস্থান। কায়—বেদনা (feeling)—চিত্ত—ধর্ম বিষয়ক আলোচনা। সম্মে একটা টীকা আছে।

২৩। পায়াসি সূত্র (২৩)। কুমারকস্মপ—পায়াসি—নংবাদ। পায়াসির এই জগতে বা পর জগতে বিশ্বাস নেই, ইত্যাদি। কুমার কস্মপ নানা যুক্তি বোঝে তাকে স্বর্কীয় মতাবলম্বী করেন। এই সূত্র মিলিন্দা-পণ্হের সরণির পথ প্রদর্শক।

অপদানং নিদানঞ্চ নিববাণঞ্চ সুদস্মনং।

জনবসভগোবিন্দং সময়ং সন্ধমেব চ।

সতিপট্টান-পায়াসি মহাবগ্গস্ম সঙ্গহো ॥

পাতিকবগ্গ

২৪। পাতিক-সূত্র (২৪)। বুদ্ধ ঋদ্ধিপ্রদর্শনে বিরত বা বস্তুর সমুৎপত্তি বিষয়ে নীরব বলে জর্নৈক শিষ্যের অগ্র গুরুর অহুসরণ।

২৫। উদুঘরিকসীহনাদ সূত্র (২৫)। নিগ্রোধ নামক সন্ন্যাসীর সম্মে ভগবান্ বুদ্ধের সন্ন্যাসধর্ম বিষয়ক আলোচনা।

২৬। চক্ৰবত্তিসীহনাদ-স্বস্ত (২৬)। নীতির কালুশ্য বর্জনপূর্বক বৈশুদ্ধা
সাধন এবং সর্বজনীন নৃপোৎপত্তি—ভবিষ্য বুদ্ধ মেন্তেয্যের প্রাদুর্ভাব।

২৭। অগ্গংগ-স্বস্ত (২৭)। বর্ণপ্রথা বিষয়ক আলোচনা ; চাতুর্ভাষ্য
সমুৎপত্তি পর্যন্ত বস্ত্তসমুৎপত্তি—বর্ণন।

২৮। সম্পাদনীয়-স্বস্ত (২৮)। বুদ্ধ-সারিপুত্ত-সংবাদ। বুদ্ধের প্রতি
সারিপুত্তের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন।

২৯। পাসাদিক-স্বস্ত (২৯)। নদ-গুরু ও অসদ-গুরু বা অপূর্ণ গুরু সম্বন্ধে
ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশাবলী।

৩০। লক্ষন-স্বস্ত (৩০)। মহাপুরুষের ৩২টি লক্ষণবিষয়ক বিবৃতি।

৩১। নিগালোবাদ-স্বস্ত (৩১)। ষট্ শ্রেণীর লোকের প্রতি গৃহস্থের
আচরণ বিষয়ে উপদেশ।

৩২। আতানাতীয়-স্বস্ত (৩২)। পূর্বদিকে ধ্বতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরুল্লক,
পশ্চিমে বিরুল্লক এবং উত্তরে কুবের - এই চারিজন নৃপতি কর্তৃক সর্বদিকের
সংরক্ষণ এবং অমঙ্গল দূরীকরণ।

পুরুষিমেণ ধতরট্টো দক্ষিণেন বিরুল্লকো।

পচ্চিমেণ বিরোপক্খো কুবেরো উত্তরং দিসং ॥

৩৩। দহস্তর স্বস্ত (৩৩)। দশ দশ পর্বারে সারিপুত্ত কর্তৃক ধর্মের
নির্দেশীকরণ।

দীঘনিকায়-সমাপ্ত

(খ) মজ্জিম-নিকায়।

মধ্যম আকারের ১৫২টি সূত্র এই নিকয়ে আছে। এই ১৫২টি সূত্র মোটামুটি বিষয়-বস্তুর শ্রেণী বিভাগ-অনুসারে ১৫টি বগ্গে সংবিভক্ত।

(১) মূলপরিয়ায়—বগ্গ।

১। মূলপরিয়ায় সূত্র (৩৫)। বিজ্ঞানোৎপত্তি বর্ণনা।

২। সন্মাসব সূত্র (৩৬)। আসব বা আশ্রব চারি প্রকার—কামাসব, ভবাসব, দিট্ঠাসব, ও অবিজ্জাসব। আসব লালসার ভাব। এই আসব সমূহের পরিহারের উপায় এখানে বিবৃত হয়েছে।

অমাত্মক ভাবধারা চিত্তকে কলুষিত করে রাখে, ফলে সত্যচিন্তন এবং নির্বাণ প্রাপ্তির পথে বাধা জন্মায়। নির্বাণ প্রাপ্তির পক্ষে এই চারি প্রকার আসবের পূর্ণ পরিহার একান্ত প্রয়োজন।

৩। ধম্মদায়াদ সূত্র (৩৭)। ধর্ম-দায়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ-পূর্বক শারীরিক বা আমিশ দায়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্তু ভিক্ষুগণকে উদ্বুদ্ধীকরণ।

৪। ভয়ভেরব সূত্র (৩৮)। জন্মের ভীতি শঙ্কা নির্জের বিষয় আলোচনা। বুদ্ধের নিজের নির্বাণ সম্পর্কিত বিবৃতি।

৫। অনঙ্কন সূত্র (৩৯)। নৈর্মল্য বা বিশুদ্ধি সম্পর্কে সারিপুত্র-মোগ্গলয়নের কথোপকথন।

৬। আকঙ্খের-সূত্র (৪০)। ভিক্ষুর অভিলষিত বিষয় সংবলিত আলোচনা।

৭। বথুপম সূত্র (৪১)। বিমলিনা আত্মবসনা এবং মলযুক্ত চিত্তের সামঞ্জস্যপূর্বক আলোচনা।

৮। স্নেহ সূত্র (৪২)। আত্মা, ভাস্ত ধারণা প্রভৃতি বিষয়ক আলোচন।

৯। সম্মাদিট্টি স্বত্ব (৪৩)। সত্য মতাবলী বিষয়ে সারিপুত্তের মত।

১০। সতিপট্ঠান স্বত্ব (৪৪)। দীঘনিকায়ের ২২নং মহাসতি স্বত্তেরই বিষয় ; তবে এখানে টীকাটি নেই।

(২) সীহনাদ বগ্গ।

১০। চুলসীহনাদ স্বত্ব (৪৫)।

১২। মহানীহনাদ স্বত্ব (৪৬)। এই দুইটি স্বত্তে ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারে উগ্র তপস্কার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

১৩। মহাহুক্কথক্কথ স্বত্ব (৪৭)।

১৪। চুলহুক্কথক্কথ স্বত্ব (৪৮)। দুঃখ সম্বন্ধে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আলাপন এই দুই স্বত্তে আছে।

১৫। অহুমান স্বত্ব (৪৯)। যোগ্গলায়ন—ভাষিত।

১৬। চেতোখিল স্বত্ব (ক)। পঞ্চ মানস বন্ধ বিষয়ে।

১৭। বনপথ (বানপ্রস্থ) - স্বত্ব। আরণ্য জীবনের সুবিধা বা অসুবিধার বিষয়ে মতপ্রপঞ্চন।

১৮। মধুপিণ্ডিক স্বত্ব। বুদ্ধপ্রদত্ত স্বকীয় মতাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং কচ্চান কর্তৃক তার প্রপঞ্চন।

১৯। ধোবাবিতর স্বত্ব (৫০)। কামাসব. নির্বাণ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা।

২০। বিতক্সথান স্বত্ব (৫১)। সন্দেহভঞ্জন নিমিত্ত ধ্যানের প্রকার।

৩। তত্তিয় বগ্গ।

২১। ককচূপম স্বত্ব (৫২)। বেদনা ও মনের সূক্ষ্ম সংযম। এমন কি, করাতে দিয়ে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও অহুত্বলতা।

২২। অলগদুপম স্তুত (৫৬)। (অলগদ—টোরা সাপ)। ধর্ম-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণের ফল সর্পকে লেজে ধরার মতই।

২৩। বস্মীক স্তুত (৫৭)। বস্মিক = বস্মীক। শরীর-বস্মীক-উপমা-মূলক শিক্ষাকাহিনী।

২৪। রথবিনীত স্তুত (৫৮)। পুন্ন—সারিপুত্ত—সংবাদ। পুন্নকর্তৃক সারিপুত্তের নিকট পবিত্র জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যান।

২৫। নিবাপ স্তুত (৫৯)। মারের প্রলোভন বাধককর্তৃক হরিণের নিমিত্ত জালবিস্তারের মত।

২৬। অরিয়পরিয়েসন স্তুত (আর্য-পর্বেষণ-স্তুত) (৬০)। মঙ্গল মার্গাহুসন্ধান। ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক স্বীয় অভিনিষ্কমণ, সত্য্যবেষণ, এবং নির্বাণপ্রাপ্তির বিবরণ প্রদান।

২৭। চুল হস্থিপদোপম স্তুত (৬১)।

২৮। মহাহস্থিপদোপম স্তুত (৬২)।

২৯। মহাসারোপম স্তুত (৬৩)। বিভিন্ন প্রকারের লাভ, সম্মান, যশঃ প্রভৃতির বিপদ। কথিত আছে দেবদত্ত নজ্জ ত্যাগ করলে এই স্তুতটি বলা হয়।

৩০। চুলসারোপম স্তুত (৬৪)। পূর্ববর্তী স্তুতের আরও বিস্তার। ধর্মসারাবাস্তি—বিষয়ক।

৪। মহাযমক বর্গগ।

৩১। চুলগোসিঙ্গ স্তুত (৬৫)। বুদ্ধের সঙ্গে ভিক্ষুত্রয়ের কথোপকথন।

৩২। মহাগোসিঙ্গ স্তুত (৬৬)। আরণ্য জীবনের শোভনত্ব সম্বন্ধে ছয় জন ভিক্ষুর মধ্যে আলাপ-আলোচন।

৩৩। মহাগোপালক স্বস্ত (৬৭)। গোপালকের একাদশ দোষগুণ আখ্যান।

৩৪। চুলগোপালক স্বস্ত (৬৮)। মূর্খ ও বুদ্ধিমান গোপালকের নদী উত্তরণ ব্যপদেশে উপদেশ।

৩৫। চুলসচ্চক স্বস্ত (৬৯)। পঞ্চ স্বস্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈন সচ্চকের সঙ্গে ভগবান্ বুদ্ধের সংলাপ।

৩৬। মহাসচ্চক স্বস্ত (৭০)। সম্যক্ ধ্যান বিষয়ে উপদেশ সহ বুদ্ধদেবের তপশ্চর্যা এবং নির্বাণ লাভ সম্বন্ধে আলোচন।

৩৭। চুল-তন্থাসংখ্য স্বস্ত (৭১)। শত্রুভুক্ত তৃষ্ণামুক্তি বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তত্ত্বের আনন্দ সহকারে যোগ্গলানের নিকট পুনঃকথন।

৩৮। মহাতন্থানংখ্য স্বস্ত (৭২)। কোনও ভিক্ষুকে “নাসে নাশ্চঃ”, “ন সো ন অঞ্ঞো” ছায়া বিষয়ে শিক্ষাদান।

৩৯। মহা-অস্পপূর স্বস্ত (৭৩)।

৪০। চুল-অস্পপূর স্বস্ত (৭৪)। তপস্বীদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটি আলাপন।

৫। চুলযমকবগ্গ।

৪১। সালেয্যক স্বস্ত (৭৫)। কোনও প্রাণী স্বর্গে, অন্য কোনও প্রাণী নরকে যায় কেন—এই বিষয়ে সালার ব্রাহ্মণগণের নিকট উক্তি।

৪২। বেরঞ্জেক স্বস্ত (৭৬)। বেরঞ্জের গৃহীদিগের নিকট এই বিষয়ে আলোচনা।

৪৩। মহাবেদল স্বস্ত (৭৭)। মকাকোষিতের সহিত সারিপুত্তের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক আলাপনা।

৪৪। চুলবেদঙ্গ স্তুত (৭৮)। বিসাতের নিকট ভিক্ষুণী ধর্মদিয়ার
মনস্তত্ত্বমূলক সংলাপ।

৪৫। চুলধম্মসমাদান স্তুত (৭৯)।

৪৬। মহাধম্মসমাদান স্তুত (৮০)। ভবিষ্যতে অখদ্গুৎ প্রসূতি বিষয়ে
সুদ্র ও বৃহৎ সংলাপ।

৪৭। মীমাংসক স্তুত (৮১)। পর্বেষণের প্রকৃত পদ্ধতি বিষয়ে উপদেশ।

৪৮। কোসাঘীর স্তুত (৮২)। বাদবিসংবাদে অপকারিতা সম্বন্ধে
কোসাঘীর ভিক্ষুগণের সহিত সংলাপ।

৪৯। ব্রহ্মনিমন্তনিক স্তুত (৮৩)। স্থিরত্বরূপ ভ্রান্তি থেকে বুদ্ধকর্তৃক
ব্রহ্মলোকে বকের সমুদ্রার।

৫০। মারতজ্জনয় স্তুত (৮৪)। যোগ্গলান কর্তৃক মারের তর্জন।

৬। গহপতিবগ্নগ।

৫১। কন্দরক স্তুত (৮৫)। চতুর্বিধ পৌরুষ সম্বন্ধে সংলাপ।

৫২। অথকনাগর স্তুত (৮৬)। আনন্দকর্তৃক নির্বাণপ্রাপ্তির উপায়
সম্বন্ধে সংলাপ।

৫৩। সেধ-স্তুত (৮৭)। কপিলবাস্তুতে ভগবান্ বুদ্ধকর্তৃক একটি
নূতন সভাগৃহ প্রতিষ্ঠা এবং আনন্দকর্তৃক শিষ্যদের শিক্ষা সংবন্ধে বক্তৃতা।

৫৪। পোতলিয় স্তুত (৮৮)। জগৎ ত্যাগের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে
বুদ্ধকর্তৃক পোতলিয়ের নিকট ব্যাখ্যান।

৫৫। জীবক স্তুত (৮৯)। বুদ্ধকর্তৃক মাংসাহারনীতি বিশ্লেষণ।

৫৬। উপালি স্তুত (৯০)। জৈন উপালির বৌদ্ধধর্মগ্রহণ।

৫৭। বুদ্ধরবতিক সুত্ত (৯১)। বুদ্ধ ও দুইজন সন্ন্যাসীর কর্মবিষয়ে আলাপ-আলোচনা।

৫৮। অভয়রাজকুমার সুত্ত (৯২)। জৈন নাতপুত্র কর্তৃক দেবদত্তের তিরস্কার বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধের নিকট রাজপুত্র অভয়ের প্রেরণ ॥

৫৯। বহুবেদনীয় সুত্ত (৯৩)। বেদনার শ্রেণীকরণ।

৬০। অপন্নক সুত্ত (৯৪)। মিথ্যার্থ ও সংঘর্ষ বিষয়ে সংলাপ।

৭। ভিক্কখুবগ্গ।

৬১। অম্বতলখিক-রাহলোবাদ সুত্ত (৯৫)। বুদ্ধকর্তৃক রাহলের নিকট মিথ্যাস্ব সম্পর্কে উপদেশ দান।

৬২। মহারাহলোবাদ সুত্ত (৯৬)। প্রাণায়াম সহ ধ্যান বিষয়ে বুদ্ধকর্তৃক রাহলকে উপদেশ দান।

৬৩। চুলমালুঙ্ক্য সুত্ত (৯৭)। অসমাধেয় প্রশ্ন বিষয়ে।

৬৪। মহামালুঙ্ক্য সুত্ত (৯৮)। পঞ্চ বন্ধ সম্বন্ধে।

৬৫। ভদালি সুত্ত (৯৯)। ভদালির স্বীকৃতি এবং বুদ্ধের উপদেশ।

৬৬। লটুকিকোপম সুত্ত (১০০)। সংসার ত্যাগ বিষয়ে উপদেশ।

৬৭। চাতুম সুত্ত (১০১)। চাতুমার কলহপরায়ণ ভিক্ষুদের প্রতি উপদেশ।

৬৮। নলকপান সুত্ত (১০২)। বুদ্ধ অহরুদ্ধকে ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করছেন।

৬৯। গুলিস্নানি সুত্ত (১০৩)। গুলিস্নানির মত অরণ্যবাসীদের দ্বন্দ্ব বিধি-নিষেধ।

৭০। কীতাগিরি সূত্র (১০৪)। বিভিন্ন শ্রেণীর ভিক্ষুদের অহুসরণীয় নিয়মাবলী।

৮। পরিস্বাজকবগ্গ

৭১। তেবিজ্জ-বচ্ছগোত্ত সূত্র (১০৫)। তাপস বচ্ছগোত্তের সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎকার এবং নিজকে তেবিজ্জ বা ত্রিবিজ্ঞ বলে খ্যাপন। এই তিন প্রকার বিজ্ঞা হচ্ছে—(১) জন্মস্মরণ (২) অলৌকিক দর্শন (৩) এবং আনন্দ-পরিহার-বিষয়ক জ্ঞান।

৭২। অগি বচ্ছগোত্ত সূত্র (১০৬)। জগদাদি বিষয়ে তথ্য নিরূপণের প্রচেষ্টার বিপদ। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের দিক থেকে এই সূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭৩। মহাবচ্ছগোত্ত সূত্র (১০৭)। উপাসক এবং ভিক্ষুগণের আচরণ সম্পর্কে বচ্ছগোত্তের নিকট বিস্তৃততর ব্যাখ্যান।

৭৪। দীঘনথ সূত্র (১০৮)। বুদ্ধের নিকট তপস্বী দীঘনথের পরামর্শ। সারিপুত্তের অর্হত্তলাভ।

৭৫। মাগন্দিয় সূত্র (১০৯)। বুদ্ধদেবের স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন পরিত্যাগ সম্বন্ধে সংলাপ এবং বাসনা-কামনা ত্যাগের বিষয়ে উপদেশ।

৭৬। সন্দক সূত্র (১১০)। তপস্বী সন্দকের ধর্ম বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন।

৭৭। মহানঙ্কলুদায়ি সূত্র (১১১)। পাঁচটি বিশেষ কারণে বুদ্ধের সম্মাননা: তদ্বিষয়ক পাঠালোচনা। এই সূত্র বৌদ্ধধর্মের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৭৮। সমনমন্দিকা সূত্র (১১২)। বিশিষ্ট গুণাবলী বিষয়ে।

৭৯। চুল-সকলুদায়ি সূত্র (১১৩)। জৈন নাতপুত্র এবং সত্যিকারের আনন্দের সন্ধান।

৮০। বেখনসন স্মৃতি (১১৪)। পূর্ব স্মৃতির কিয়দংশের পুনরুক্তি এবং পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধে ব্যাপকতর আলোচনা।

৯। রাজবগ্গ

৮১। ঘটীকার স্মৃতি (১১৫)। জ্যোতিপাল রূপে বুদ্ধদেবের নিজ পূর্ব জন্ম; সেই সম্বন্ধে আনন্দের সহিত ভাষণ।

৮২। রট্টপাল স্মৃতি (১১৬)। রট্টপাল কাহিনী। তাঁর মাতাপিতা বৃথাই তাঁকে সম্ব্যে ঘোণ দিতে বাধা দিলেন।

৮৩। মখাদেব স্মৃতি (১১৭)। বুদ্ধদেব কোনও পূর্ব জীবনে রাজা মখাদেব ছিলেন; তার বিবরণ।

৮৪। মধুর স্মৃতি (১১৮)। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর কচ্চান রাজা অবন্তিপুত্রকে বর্ণের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

৮৫। বোধিরাজকুমার স্মৃতি (১১৯)। বুদ্ধদেব পূর্বের মত (যেমন ৬০ এবং ৭০ নং স্মৃতিতে তার মহাভিনিক্ষেপ ও নির্বাণ সম্বন্ধে বলছেন।

৮৬। অঙ্গুলিমাল স্মৃতি (১২০)। ডাকাতির সর্দার অঙ্গুলিমালের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। এই স্মৃতি থেকে তাত্‌কালিক সামাজিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

৮৭। পিয়জাতিক স্মৃতি (১২১)। পুত্রহারা ব্যক্তির প্রতি বুদ্ধের উপদেশ এবং ঐ বিষয় নিয়ে রাজা পসেনদির সঙ্গে তাঁর পত্নীর বিসংবাদ।

৮৮। বাহিতিক স্মৃতি (১২২)। আনন্দ পসেনদির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন; পসেনদি কর্তৃক আনন্দকে একটি বিদেশী বস্ত্রোপহার দান।

৮৯। ধম্মচেতিয় স্মৃতি (১২৩)। বুদ্ধের সঙ্গে পসেনদির সাক্ষাৎকার এবং পবিত্র ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে—পসেনদির বিশেষ অত্মরাগ প্রকাশ।

৯০। করকট্টল স্মৃতি (১২৪)। দেব, বর্ণপ্রথা এবং ব্রহ্মা সম্পর্কে বুদ্ধের সঙ্গে পসেনদির কথোপকথন।

১০। ব্রাহ্মণ বগ্গ

৯১। ব্রহ্মায়ু স্তুত (১২৫)। মহাপুরুষের দ্বাত্রিংশ লক্ষণ এবং ব্রাহ্মণ ব্রহ্মায়ুর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ।

৯২। সেল স্তুত (১২৬)। বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ দেখে ব্রাহ্মণ সেল বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহ করেন। এই কাহিনী স্তুত-নিপাতের ৩.৭ এ আছে।

৯৩। অস্ফলায়ন স্তুত (১২৭)। বুদ্ধের সঙ্গে ব্রাহ্মণ অস্ফলায়নের বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা। এই স্তুতে বুদ্ধদেবের বর্ণপ্রথা বিষয়ক অভিমত অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

৯৪। ঘোটমুখ স্তুত (১২৮)। ঘোটমুখ কর্তৃক সঙ্গীতি-গৃহ নির্মাণ এবং ইহার প্রতিষ্ঠাসময়ে উদেনের ভাষণ।

৯৫। চক্কি স্তুত (১২৯)। ব্রাহ্মণ্য মতবাদের পর্যালোচনা।

৯৬। এম্কারি স্তুত (১৩০)। বর্ণপ্রথা এবং ইহার বিভিন্ন দিক।

৯৭। ধানঞ্জানি স্তুত (১৩১)। সারিপুত্র ব্রাহ্মণ ধানঞ্জানিকে বলছেন যে পরিবারের প্রতি কর্তব্য অথায় কার্য সাধনের পক্ষে কোনও যুক্তিই নয়।

৯৮। বাসেথ স্তুত (১৩২)। কবিতার আকারে সত্যিকার ব্রাহ্মণের স্বভাব সম্বন্ধে পর্যালোচনা। (=স্তুতনিপাত, ৩.৯)।

৯৯। সুভ স্তুত (১৩৩)। গৃহী ও সন্ন্যাসীর কর্তব্যাকর্তব্য বিনির্ণয়।

১০০। সঙ্গারব স্তুত (১৩৪)। বৌদ্ধধর্মাবলম্বিনী কোনও রমণীর ধর্মজীবন সম্বন্ধে সংলাপ। (৬০) এবং (৭০) নম্বরের কিয়দংশের পুনরাবৃত্তি।

১১। দেবদহ বগ্গ

১০১। দেবদহ স্তুত (১৩৫)। জীবনচর্চার দ্বারা লক্ষ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ।

১০২। পঞ্চস্তম্ভ স্মৃত (পঞ্চস্তম্ভ স্মৃত) (১৩৬)। আত্মবিষয়ে পাঁচটি সিদ্ধান্ত ;
কিন্তু নির্বাণ এর কোনওটারই উপর নির্ভর করেন।

১০৩। কিন্তু স্মৃত (১৩৭)। ধর্মবিসংবাদ এবং অত্যাচারকারী ভিক্ষুদের
জন্ত বিধান।

১০৪। সামগাম স্মৃত (১৩৮)। নাতপুত্রের মৃত্যুর পর বাদবিসংবাদ
ও পুনর্মিলন সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধের ভাষণ (উপরের ২২ দ্রষ্টব্য)।

১০৫। স্ননকথিত স্মৃত (১৩৯)। বাসনাশল্যসমুদ্বার।

১০৬। অরঞ্জপার স্মৃত (১৪০)। নিকি, সত্যিকার মোক্ষ প্রভৃতি
বিষয়ে ধ্যান।

১০৭। গণকমোগ্গলান স্মৃত (১৪১)। শিষ্যদের শিক্ষাদান বিষয়ে
গণকমোগ্গলানকে উপদেশ প্রদান।

১০৮। গোপকমোগ্গলান স্মৃত (১৪২)। ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরি—
নির্বাণের পরে আনন্দ বসুসকারকে বলছেন যে ধর্মই একমাত্র নেতা।

১০৯। মহাপুন্নম স্মৃত (১৪৩)। খন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধ কর্তৃক কোনও ভিক্ষুর
প্রশ্নের উত্তর প্রদান।

১১০। চুলপুন্নম স্মৃত (১৪৪)। উত্তম ও অধম মানব সম্বন্ধে ভাষণ।

১২। অনুপদ বগ্গ

১১১। অনুপদ স্মৃত। বুদ্ধ কর্তৃক সারিপুত্রের প্রশংসা।

১১২। ছন্সিসোধন স্মৃত (ষড়-বিশোধন-স্মৃত) (১৪৬)। যে ভিক্ষু
অর্হন্ত প্রাপ্তি বিষয়ে ঘোষণা করেন, তাঁকে জিজ্ঞাস্ত প্রশ্ন।

১১৩। সপ্পুরিস স্মৃত (সৎপুরুষ-স্মৃত) (১৪৭)। ভিক্ষুর দোষগুণ।

১১৪। সেবিতক্ক-অসেবিতক্ক স্মৃত (১৪৮)। এখানে সারিপুত্র ধর্মট
জীবন উত্থাপন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করছেন।

১১৫। বহুধাতুক স্তুত (১৪৯)। বুদ্ধ-আনন্দ-সংবাদ-ধাতু প্রভৃতি বিষয়ে।

১১৬। ইসিগিলি স্তুত (ঋষিগিলি স্তুত)। পক্ষে-বুদ্ধ সম্বন্ধে বুদ্ধের

অভিমত।

প্রত্যেক বুদ্ধ নিজে মুক্ত, কিন্তু মুক্তি বিষয়ে প্রত্যেক বুদ্ধ অত্বে সাহায্য করতে পারে না; সাধারণতঃ বনে জঙ্গলে বা স্থানান্তরে একাকী তাঁদের জীবন অবসান হয়ে যায়।

১১৭। মহাচতুরারীসক স্তুত (১৫১)। আর্থ অষ্টাঙ্গ মার্গ ব্যাখ্যান।

চতুরারীসক = ৪০ প্রকার।

১১৮। অনাপানসতিঃ স্তুত (১৫২)। প্রাণায়াম সম্বন্ধে ভাষণ।

১১৯। কায়গতাসতি স্তুত (১৫৩)। শরীর বিষয়ে ধ্যান।

১২০। সংস্কারপ্পত্তি স্তুত (১৫৪)। পঞ্চ সংস্কারের পরিপূর্তি; এবং ভিক্ষুর পুনর্জন্ম প্রকার নির্ধারণ।

১৩। সুঞ্জ্ঞতা বগ্গ

১২১। চুল-সুঞ্জ্ঞতা স্তুত (১৫৫)। শূন্যতা বিষয়ে ধ্যান।

১২২। মহাসুঞ্জ্ঞতা স্তুত (১৫৬)। শূন্যতা বিষয়ক ধ্যানাভ্যাসের

নিমিত্ত আনন্দকে উপদেশ প্রদান।

১২৩। অচ্চারিষব্ভূতধম্ম স্তুত (১৫৭)। বোধিসত্ত্বের জীবন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত। চতুর্দশ স্তবের কিয়দংশও এই স্তব্বে আছে; তবে বুদ্ধের নিজের বিষয়েই এই স্তব্বে উক্ত হয়েছে।

১২৪। বক্কুল স্তুত (১৫৮)। বক্কুল তাঁর মিত্র অচেনকস্পপকে ধর্মাস্তরিত করছেন।

১২৫। দন্তভূমি স্তুত (১৫৯)। হস্তিশিক্ষার উদাহরণের মাধ্যমে ধর্মের একজন অগ্রজনকে কি করে উপদেশ দেবেন, বুদ্ধদেব তাঁর উপদেশ দিচ্ছেন।

১২৬। ভূমিজ স্মৃতি (১৬০)। ভূমিজ রাজা জয়সেনের প্রণের উত্তর দিচ্ছেন।

১২৭। অম্বুজ স্মৃতি (১৬১)। অম্বুজ গৃহী পঞ্চকন্দের নিকট মনঃসমুদ্রের বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন।

১২৮। উপকিলেস স্মৃতি (১৬২)। বুদ্ধ কোশাঘীর ভিক্ষুগণের মধ্যে বাদ বিনংবাদের মীমাংসা করছেন এবং সম্যক্ ধ্যান বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন।

১২৯। বালপণ্ডিত স্মৃতি (১৬৩)। মৃত্যুর পরে শান্তি ও পুরস্কারের বিষয়ে বিবৃতি।

১৩০। দেবদূত স্মৃতি (১৬৪)। মৃত্যু দূতগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগণের অদৃষ্ট বিষয়ে।

১৪। বিভজ্ঞ বগ্গ।

১৩১। ভদেকরত্ত স্মৃতি (১৬৫)। প্রথম সপ্তকে টীকানহ চারিটা শ্লোক।

১৩২। আনন্দ ভদেকরত্ত স্মৃতি (১৬৬)। ঐ শ্লোকচতুষ্টয়ের আনন্দকৃত ব্যাখ্যান।

১৩৩। মহাকচ্চান ভদেকরত্ত স্মৃতি (১৬৭)। মহাকচ্চানকৃত ঐ শ্লোক চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যান।

১৩৪। লোমসকঙ্কীয় ভদেকরত্ত স্মৃতি (১৬৮)। লোমসকঙ্কীয়ের নিকট ভগবান্ বুদ্ধ ঐ শ্লোকচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করছেন।

১৩৫। চুলকম্মবিভজ্ঞ স্মৃতি (১৬৯)। কর্মের বাবতীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তির উপরে প্রভাব বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ।

১৩৬। মহাকম্মবিভজ্ঞ স্মৃতি (১৭০)। কর্মজনিত ফল বিষয়ে বুদ্ধ কোনও তপস্বীর বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ করছেন।

১৩৭। সলায়তন বিভজ্ঞ স্মৃতি (১৭১)। ষড়্বিধির বিষয়ক আলোচনা।

১৩৮। উদ্দেশবিভজ্ঞ স্মৃতি (১৭২)। মহাকচ্চান বিজ্ঞানের এক দেশ উদ্ঘাটন করছেন।

১৩৯। অরণবিভঙ্গ স্তুত (১৭৩)। মজ্জিম-পটিপদা।

১৪০। ধাতুবিভঙ্গ স্তুত (১৭৪)। পুঙ্খসাতি শিক্ষাদানের উৎকর্ষ থেকেই
ভগবান্ বুদ্ধকে চিনতে পারেন। ধাতু বিশ্লেষণ
১৪১। সচ্চবিভঙ্গ স্তুত (১৭৫)। চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে। সারিপুত্তের
অভিমত।

১৪২। দক্ষিণাবিভঙ্গ স্তুত (১৭৬)। দান ও দাতা সম্বন্ধে।

১৫। সলায়তন বগ্গ।

১৪৩। অনাথপিণ্ডিকোবাদ স্তুত (১৭৭)। অনাথপিণ্ডিকের মৃত্যু,
তুসিত সর্গে তাঁর পুনর্জন্ম এবং বুদ্ধের নিকট তাঁর পুনরাগমন।

১৪৪। ছন্নোবাদ স্তুত (১৭৮)। ছন্নের অস্বস্থতাকালে সারিপুত্ত তাঁকে
উপদেশ দিচ্ছেন। ছন্ন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।

১৪৫। পুন্নোবাদ স্তুত (১৭৯)। সুখহুঃখ ভোগ সম্বন্ধে পুন্নকে বুদ্ধের
উপদেশ দান।

১৪৬। নন্দকোবাদ স্তুত (১৮০)। অনিত্যতা সম্বন্ধে নন্দক মহাপ্র-
জাপতী এবং ৫০০ ভিক্ষুগীকে উপদেশ দিচ্ছেন।

১৪৭। চুল্লাহলোবাদ স্তুত (১৮১)। বুদ্ধ রাহুলকে বনে নিয়ে গিয়ে
অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। দেবতাও এই ভাষণে যোগদান দেয়।

১৪৮। ছছক্ক স্তুত (১৮২)। ৬×৬ ইন্দ্রিয়।

১৪৯। মহাসলায়তনিক স্তুত (১৮৩)। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান।

১৫০। নগরবিনেদ্য স্তুত (১৮৪)। জমস্ত তপস্বী ও ব্রাহ্মণগণের
প্রকার ভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধ উপদেশ দিচ্ছেন।

১৫১। পিণ্ডপাত পারিসুদ্বি স্তুত (১৮৫)। শিষ্যের শিক্ষাপ্রদান
বিষয়ে সারিপুত্তের উপদেশ।

১৫২। ইন্দ্রিয় ভাবনা স্তুত (১৮৬)। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সম্বন্ধে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ
পারাসবিয়ের সমস্ত পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে স্বকীয় পদ্ধতির উৎকর্ষ বিশ্লেষণ
করছেন।

মজ্জিমনিকায় সমাপ্ত

(৩) সংযুক্ত-নিকায়

শ্রেণীবিভক্ত স্বত্ত। পাঁচ বগ্গ বা অধ্যায়ে সর্বসমেত ৫৬টি সংযুক্ত আছে।
তন্মধ্যে প্রথম সগাথবগ্গে ১১টি, দ্বিতীয় নিদানবগ্গে দশটি, তৃতীয় খঙ্কবগ্গে
তেরটি, চতুর্থ সলায়তনবগ্গে দশটি এবং মহাবগ্গে বারটি সংযুক্ত ॥

(১) সগাথবগ্গ (১১) সংযুক্ত

১। দেবতা সংযুক্ত (১৮৭)	৬। ব্রহ্ম (১২২)
২। দেবপুত্র (১৮৮)	৭। ব্রাহ্মণ (১২৩)
৩। কোসল (১৮৯)	৮। বজ্রীশ (১২৪)
৪। যার (১২০)	৯। বন (১২৫)
৫। ভিক্ষুণী (১২১)	১০। বন্ধু (১২৬)
	১১। সন্ধ (১২৭)

(২) নিদান বগ্গ।

এই বগ্গের প্রথম সংযুক্ত থেকেই বগ্গটির নাম হয়েছে। নিদান বর্গে
প্রতীত্যসমুৎপাদের ১২টি নিদান আছে।

১। নিদান সংযুক্ত (১২৮)	৬। লাভ সন্ধার (২০৩)
২। অভিসময় (১২৯)	৭। রাহুল (২০৪)
৩। ধাতু (২০০)	৮। লক্ষণ (২০৫)
৪। অনমতগ্গ (২০১)	৯। ওপন্ন (২০৬)
৫। কাসম্প (২০২)	১০। ভিক্ষু (২০৭)

(৩) থন্ধ—বগ্গ।

এই বগ্গে ১৩টি সংযুক্ত আছে।

স্বন্ধ-নম্ভের উপরে সংযুক্তটি নিয়ে এর আরম্ভ।

১। থন্ধ সংযুক্ত (২০৮)	৭। সারিপুত্ত (২১৪)
২। রাধ (২০৯)	৮। নাগ (২১৫)
৩। দিট্ঠি (২১০)	৯। স্থপন্ন (২১৬)
৪। ওকন্তিক (২১১)	১০। গন্ধক্কায় (২১৭)
৫। উপ্পাদ (২১২)	১১। বলাহ (২১৮)
৬। কিলেস (২১৩)	১২। কচ্ছগোত্ত (২১৯)
	১৩। সমাধি (২২০)

৪। সলায়তন বগ্গ

এই বগ্গে ১০টি সংযুক্ত।

বড়িঙ্গিয় সংযুক্ত নিয়ে এর আরম্ভ ; তার থেকেই এই বর্গের নাম।

১। সলায়তনসংযুক্ত (২২১)	৬। মোগ্গল্লান (২২৬)
২। বেদনা (২২২)	৭। চিত্ত (২২৭)
৩। মাতুগাম (২২৩)	৮। গামনি (২২৮)
৪। জম্মুখাদক (২২৪)	৯। অসংখত্ত (২২৯)
৫। সামন্দক (২২৫)	১০। অব্যাকত (২৩০)

৫। মহাবগ্গ

এই বগ্গে ১২টি সংযুক্ত আছে। অষ্টাঙ্গমার্গের উপরে এর প্রথম সংযুক্ত।

১। মগ্গসংযুক্ত (২৩১)	৭। ইন্ধিপাদ (২৩৭)
২। বোজ্জব্বজ্জ (২৩২)	৮। অমুক্ক (২৩৮)
৩। সতিপট্ঠান (২৩৩)	৯। বান (২৩৯)
৪। ইন্ধিয় (২৩৪)	১০। অনাপান (২৪০)
৫। সম্মগ্গধান (২৩৫)	১১। সোতাপত্তি (২৪১)
৬। বল (২৩৬)	১২। সচ্চ (২৪২)

অঙ্গুত্তরনিকায়

অঙ্গুত্তর-নিকায়ে বিষয়-বিভাগ করা হয়েছে সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। এতে আছে ১১টি নিপাত। প্রথম নিকায়ে একটি বিষয়, দ্বিতীয় নিকায়ে দুই সংখ্যার বিষয়, তৃতীয় নিকায়ে তিনটি সংখ্যার বিষয়—এই হিসাবে ১১টি সংখ্যার বিষয় নিয়ে ১—১১ পর্যন্ত নিপাত করা হয়েছে। এক একটি নিপাতে কতিপয় বগ্গ, এবং প্রত্যেক বগ্গেই দশ বা ততোধিক স্তম্ভ। মোটের উপর অঙ্গুত্তর-নিকায়ে ২৩০৮টি স্তম্ভ আছে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের নিপাতসমূহ

১। এক নিপাত (২৪৩)	৭। সত্তক (২৪৯)
২। দুক (২৪৪)	৮। অট্ঠক (২৫০)
৩। তিক (২৪৫)	৯। নবক (২৫১)
৪। চতুস্ক (২৪৬)	১০। দশক (২৫২)
৫। পঞ্চক (২৪৭)	১১। একাদশক (২৫৩)
৬। ছক (২৪৮)	

অঙ্গুত্তর-নিকায় সমাপ্ত

৫। খুদ্ধক নিকায়

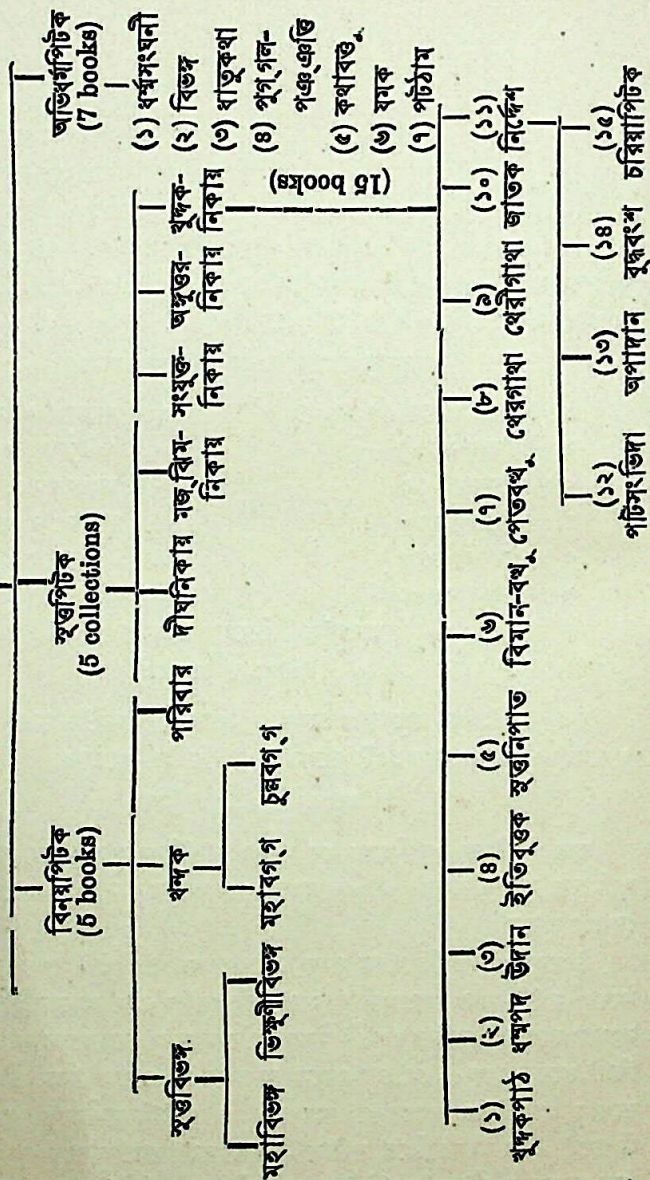
স্বস্ত পিটকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থসমূহ নিয়ে এই খুদ্ধকনিকায় ॥ এই গ্রন্থের প্রথমেই এই নিকায়ের ১৫টি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত আছে।

অভিধর্ম—পিটক

স্বস্ত পিটকে ধর্মবিষয়ে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব আছে, তারি দর্শনপট-ভূমিকায় সার্থক রূপায়ণ। এখানকার গ্রন্থ সপ্তকের নামও গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেওয়া আছে।

উপরের এই পালিধর্মগ্রন্থ সমূহ খেরবাদের অন্তর্গত। অত্যাশ্রয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাশ্রিতবাদ সম্প্রদায়ই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং তাঁদের গ্রন্থ অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। এই সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থের মূল কালের প্রকোপে বিনষ্ট হয়ে গেছে; সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলি গ্রন্থের বিষয় চীন ও তিব্বতী ভাষায় সংরক্ষিত আছে। খেরবাদী ও সর্বাশ্রিতবাদীদের স্বস্ত এবং বিনয় নিশ্চয়ই এক বিষয় নিয়ে রচিত—কিন্তু সর্বাশ্রিতবাদিগণের অভিধর্মে সাতটি গ্রন্থ থাকলেও এই অভিধর্মপিটক খেরবাদীদের অভিধর্ম থেকে ভিন্ন ॥

ত্রিপিটক Tripitaka



বৌদ্ধ মূলশাস্ত্র গ্রন্থ

ত্রিপিটক-প্রচারের ইতিহাস ॥

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে ধীরে ধীরে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সংগৃহীত হয়। এই বাণীসম্ভার বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এই তিন ভাগে বিভক্ত বলে বৌদ্ধ মূল ধর্ম শাস্ত্রের নাম ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটকের কিছু অংশ প্রাবক ভাষিত, কিছু ঋষি এবং দেব ভাষিত। কথিত আছে যে ত্রিপিটকে সরিষা ৮৪,০০০ চুরাশী হাজার সূত্রের মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধ ৮২,০০০ বিরাশী হাজার সূত্র নিজেই বিবৃত করেছিলেন। অবশিষ্ট দুই হাজার অশ্বাশ্বদের।

এই সূত্রগুলি কিন্তু পাণিনির ধরণের সূত্র নয়। এখানে সূত্র অর্থে বোঝায় এক একটা কাহিনী, সমগ্র উপদেশ, Discourse, Lesson. ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর ৩৫ পয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বোধি-প্রাপ্তির সময় থেকে ৮০ বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত নিরন্তর যে উপদেশ, ভাষণ প্রভৃতি প্রদান করেছিলেন, তার সমুদয় এই—ত্রিপিটক—এই কর্ম ও ধর্ম-বীরের বলিষ্ঠ ও ধর্মিষ্ঠ জীবনে আহার-নিদ্রা করার সময় ছিল কিনা, অথবা কোন্ অপৌরুষের শক্তির বলে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়—তাই কেবল অবাধ হয়ে ভাবতে হয়। এই গ্রন্থের মাধুর্য, সৌন্দর্য, জ্ঞানগরিমা, মার্গদেশনা প্রভৃতি আজকের এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আজ আমরা এখানে এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করবো, যা ইতঃপূর্বে পর্যালোচিত হয়নি বললেই অত্যাুক্তি হয় না। সেটা হচ্ছে—ভারতবর্ষের বাইরে যুগে যুগে ত্রিপিটক-প্রচারের ইতিহাস এবং চীন-কোরিয়া-জাপান, অশ্বদিকে

তিক্ষত, এবং ব্রহ্ম-শ্রাম-কষোজ-সিংহলে প্রচারিত ত্রিপিটকের তুলনা-মূলক সগোত্রত্ব, অর্থাৎ একই মূলধার থেকে উদ্ভূত হয়েও এই ত্রিপিটক—পুনরায় কি করে ভিন্ন রূপায়ণ পরিগ্রহ করেছে, তার একটি স্বস্বায়তন বিবৃতি। স্থানাভাব হেতু এখানে তিক্ষতীয় ত্রিপিটকের উপরেই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে।

শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও ত্রিপিটকের এত প্রচারের মুখ্য কারণ—মহামতি রাজশুকুল-ধুরন্ধর সম্রাট অশোক (রাজত্ব সময় খৃঃ পূঃ ২৭৪—২৩২)। বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহণের পরে তিনি স্বকীয় জীবনে যে পরমা শান্তি লাভ করেছিলেন, তার বিশ্বব্যাপিনী ব্যাপ্তি তিনি আকাজক্ষা করেছিলেন—তজ্জগৎ ভারতের নিকটবর্তী দেশ সমূহেও তিনি ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। ত্রিপিটক-রূপে সংগৃহীত ভগবান বুদ্ধের বাণী ভারতের পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশবিদেশে প্রচার করতে লাগলেন। “কালস্ত কুটীলা গতিঃ”। যদিও ত্রিপিটকের উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ, তা হলেও ত্রিপিটক ভারতের বাইরে সমধিকভাবে স্বীয় সৌরভ ও স্নহমা বিস্তার করতে লাগলো। যুগে যুগে কত শত শত, সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ মহামনীষীরা চীন, কোরিয়া, জাপান, তিক্ষত, ব্রহ্ম, সিংহল, শ্রাম, কষোজ প্রভৃতি অঞ্চলে এই মহামহিমময় গ্রন্থের বাণী প্রচারের জন্ত দেহ মনঃ প্রাণ সমর্পণ করে ভারতের শাশ্বত ধর্মজিজ্ঞাসার আলো চিরপ্রোজ্জ্বল রেখে গেছেন, কে জানে ?

দেশে দেশে প্রচারিত ত্রিপিটক সমূহের মধ্যে তিনটি ত্রিপিটক সমধিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। প্রথমতঃ, খেরবাদীদের পালি ত্রিপিটক—শ্রাম, কষোজ, ব্রহ্ম ও সিংহলে এর প্রচলন। দ্বিতীয়তঃ—চীনভাষায় লিখিত চীন, কোরিয়া ও জাপানে প্রচলিত ত্রিপিটক। তৃতীয়তঃ—তিক্ষতীয় ত্রিপিটক।

পাশ্চাত্য মনীষীদের অত্যধিক আগ্রহের ফলে খেরবাদীদের পালি ত্রিপিটকই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে রিস ডেভিডস্ দম্পতীর

নামই সর্বাত্রে উল্লেখযোগ্য। নিখিল বিশ্বে পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বহুল প্রচারে তাঁদের সংস্থাপিত পালি টেক্সট সোসাইটির দান অনবদ্য। ১৯৩৭-৪১ সালে ডাঃ টাকাকুসু জুনজিরোর (Takakusu Junjiro) সম্পাদনায় পালি ত্রিপিটকের অল্পবাদ জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয় ৬০ খণ্ডে।

চীনদেশীয় ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশ চীন, কোরিয়া ও জাপানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল; এবং ত্রিপিটকাস্তর্গত গ্রন্থ সমূহের পাঠেও অনেক পার্থক্য ছিল। আকৃতিতেও ছিল অতি পুরাণ ধরণের। কিছুকাল পূর্বে ডাঃ টাকাকুসু এবং ওয়াটানাবে কৈক্যোকু ঐ সকল উপাদান সংগ্রহপূর্বক তার এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

তিব্বতীয় ত্রিপিটক ॥

বৌদ্ধধর্ম তিব্বত দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। তখনকার রাজা Sron-bstan Sgam-po স্বদেশে লেখ্য ভাষার প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনবোধে Thon-mi san-bho-ta-কে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে পারদ্রুত করবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের উচ্চ আদর্শে তিনি তিব্বতীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং লিখিত ভাষার প্রবর্তন করেন। এই লিখিত ভাষার প্রবর্তনের ফলেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রসার এবং ভারতীয় ভাবধারার পূর্ণ প্রবর্তন সংঘটিত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজা Khri-sron-lde-bstan সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্ব সময়ে তিব্বত সমধিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় ঐ সময়ে অনূদিত হয়। নবম শতাব্দীর আরম্ভে রাজা Ral-pa-can-র সময়েই বৌদ্ধ ধর্মের আরো প্রসার ঘটে; পূর্বের অল্পবাদ সমূহের পুনরালোচনা এবং স্থল বিশেষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অল্পবাদ তখন করা হয়। বর্তমান

সময়ে তিব্বতীয় ত্রিপিটকে যে সকল গ্রন্থ আছে, সেগুলির অর্ধেকের থেকে বেশী পুস্তক ঐ সময়েই অনুদিত হয়। এই অল্পবাদ অতি উচ্চাঙ্গের। কিন্তু এই রাজার কতিপয় সমৃদ্ধিশালী প্রজা তাঁর বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যাশক্তির জন্ত তাঁর প্রতি বিশেষ বিরূপ হন এবং ফলে, তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন।

তৎপরবর্তী রাজা Ghan-dar-ma বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং ঐ সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের কোনও প্রকার উন্নতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে Rin-chen-bzan-po এবং খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরম সুপণ্ডিত অতীশের প্রাচুর্যাবের ফলে তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রসৃতিলাভ করতে থাকে। পুনরায় অল্পবাদ-কার্য চলতে থাকে। চীনদেশে এ সময়ে সুঙ্গ-রাজত্ব সময়; তখন বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে অবসাদগ্রস্ত। কিন্তু তিব্বতে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রতুল প্রভাব। ঐ সময় থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতে নিরন্তর সংস্কৃত গ্রন্থের অল্পবাদ হয়েছে। Sde-dge সংস্করণের পরিাশষ্ট পাঠে জানা যায় যে এই অল্পবাদ কার্যে ১০৭ জন ভারতীয় ও ২২২ জন তিব্বতী মনীষী আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন।

তিব্বতীয় ত্রিপিটক কঞ্জুর (Kanjur) ও তঞ্জুর (Tanjur) এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সূত্র ও বিনয় এবং দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মন্ত্র-তন্ত্র এবং ভূগোল, ইতিহাস, তর্ক, ভৈষজ্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ। যদিও খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই ত্রিপিটক, তাহলেও পিকিং, দি-গি (Sde-dge) এবং স্নরথ (Snar-than) সংস্করণই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জাপানের ওটানি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পিকিং সংস্করণটি সংরক্ষিত আছে, তার কঞ্জুর-ভাগে তন্ত্রের ৭২৯, প্রজ্ঞাপারমিতার ৩০, রত্নকূটের এক, অবতংসকের এক, সূত্রান্ত ২৬৮ এবং বিনয়ের ২৬টি—মোট ১০৫৫টি গ্রন্থ আছে। তঞ্জুরের ভাগে স্তোত্র-গণের ৬৪,

তন্ত্রবৃত্তির ২৬৪০, প্রজ্ঞাপারমিতার ৪১, মধ্যমকের ১৫৮, অভীশের মধ্যমক
টীকা দীপঙ্কর-জ্ঞানের ১০৩, সূত্রাস্ত্র বৃত্তির ৩২, চিত্তমাত্রের ৬৭, অভিধর্ম-শাস্ত্রের
২০, বিনয় টীকা ৪৫, জাতক ৬, পরিকথা ও লেখ ৪৫, হেতুবিজ্ঞা ৬৭,
শব্দ-বিজ্ঞা ২৮, চিকিৎসাবিজ্ঞা ৭, শিল্পবিজ্ঞা, নীতিশাস্ত্র ও আশ্চর্য-শাস্ত্র ৪৪,
পুনরায় আশ্চর্যশাস্ত্র ১৪৭ এবং সূচীলিপি ১—এই মোটের উপর ৩৫২২টি
গ্রন্থ। তাহলে মোটের উপর কঙ্কুর ও তঙ্কুরে মিলে $১০৫৫ + ৩৫২২ = ৪৫৭৭$
গ্রন্থ তিস্ততী ত্রিপিটকে আছে। এবং কঙ্কুর গ্রন্থে রাখবার জন্য ১০৭ এবং
তঙ্কুরের জন্য ২২৫ = ৩৩২টি রক্ষণস্থান বিনির্মিত হয়েছে।

উপরিলিখিত বর্ণনা থেকে এটা স্থম্পষ্ট যে ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও
সর্ববিধ ইতিহাসের দিক থেকে এই গ্রন্থ এক অনবদ্য, অমূল্য সম্পদ।

চীন-কোরিয়া-জাপানে প্রচারিত ও প্রচলিত ত্রিপিটকে গ্রন্থের সংখ্যা
তিস্ততীয় ত্রিপিটকের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। কারণ শেষোক্ত গ্রন্থের
কঙ্কুরের মাত্র ৪৪৪টি গ্রন্থ চীন-কোরিয়া-জাপানী ত্রিপিটকে দৃষ্ট হয়।
সমভাবে, তঙ্কুরের ১০৭টি গ্রন্থ মাত্র চীন-কোরিয়া-জাপানী ত্রিপিটকে অন্তর্ভুক্ত
হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের সঙ্গে তুলনায় তিস্ততীয় ত্রিপিটকের অবস্থা
একই।

এখানে দুটি বিষয়ের মাত্র উল্লেখ করে আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি।
প্রথমতঃ, তিস্ততীয় লেখ্য ভাষা সংস্কৃতের আদর্শে অনুপ্রাণিত—শুধু নয়,
বিনির্মিত বলে তিস্ততীয় ত্রিপিটক থেকে সংস্কৃত ত্রিপিটকের মূল সমুদ্বার
সম্ভবপর। সুদূর মধ্য-এসিয়ার মরুভূমি ও নেপাল অঞ্চল থেকে যে সকল
ত্রিপিটক-গ্রন্থের অংশ বিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সংখ্যা তুলনায় অতি
মুষ্টিমেয়। এটা বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রের সংস্কৃত মূলটির আবিষ্কার
প্রচেষ্টা যেমন একান্ত দরকার, তদভাবে তিস্ততীয় ত্রিপিটক থেকে যথাসম্ভব
মৌলিক সংস্কৃত ত্রিপিটক সমুদ্বার করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অভীশ
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, পদ্মসম্ভব, জননী লক্ষ্মীংকরা, জননী চিন্তা প্রভৃতি—যাদের

অনেকেই বাঙ্গালী—মহামনীষীরা এই সংস্কৃত জ্ঞানগরিমা ত্রিপিটকের সাহায্যে সুপ্রকট করে গেছেন। অতীতকালে, পালি ত্রিপিটকই যে ভগবান্ বুদ্ধের সত্যধর্মের একমাত্র প্রতীক, তা' ভাববার কারণ নেই। সংস্কৃত ত্রিপিটক, সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হ'লে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ আরো সুপ্রকট হ'বে। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সকলেই তো সংস্কৃতের মহাধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—সংস্কৃত সাহিত্য রসপিপাসু মাত্রেই আজ ভাববার ও বোঝবার দিন এসেছে—যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য কেবল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, দর্শন, ক্রিয়াকলাপ, কাব্যাদিতেই সীমাবদ্ধ নয়। পালি সাহিত্যে যা' কিছু ছিল বা আছে, তা সংস্কৃতেও স্থলিখিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ভারতবর্ষে হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এ সাহিত্যও—সংস্কৃত বাহ্য হলেও—ভারতের বাইরে গিয়ে, বিশেষতঃ তিব্বত, জাপান, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করেছে। মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ বেশীর ভাগই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত ধারা সত্যই ভালবাসেন, সংস্কৃতির ধারা ধারক-বাহক—তাদের অবশ্য কর্তব্য—এই সমস্ত লুপ্ত রত্ন সমুদ্বার করা। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন ভারতবর্ষেরই অক্ষয় প্রাণশক্তির এক অপূর্ব প্রকাশ—যা' বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনসমাজকে এখনও বিমুগ্ধ করে রেখেছে, এবং ধারা সেজন্ত ভারতবর্ষকে তাঁদের আধ্যাত্মিক মাতৃভূমি বা Spiritual Motherland মনে করেন। এই বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার হলে সংস্কৃতসাহিত্যের পরিধি ও গভীরতা দ্বিগুণ বর্ধিত হবে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ভারতবাসী মাত্রেই অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ম্যাক্সমুলার তাঁর Renaissance Theoryতে বলেছিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পাদদেশ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বৎসর বা কিছুদূরকাল সংস্কৃত সাহিত্য নিদ্রিত, স্তিমিত ছিল (Sanskrit went to sleep)। এ সময় বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান ও জগদ্ব্যাপী প্রচারের সময়। তা'হলেও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ এ সময়ে বিরচিত হয়েছিল—সে সময় তাদের প্রচার হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই—যে অগণিত বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ঐ সময়ে ভারতবর্ষে বিরচিত হয়েছিল এবং যে সকল গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ বা কয়েকটি পূর্ণ গ্রন্থের সমৃদ্ধার সম্ভবপর হয়েছে, তাও প্রায় বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞানগম্য; আমাদের দেশে তার সুপ্রচার হয়নি—এবং সে সকল অপূর্ব ভাবসম্পদ, ভাষার গৌরব ও লালিত্য, রচনার পারিপাট্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা মোটেই অবগত নই।

এর একটা কারণ হলো এই—বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা পালি পড়েন, সংস্কৃত গ্রন্থের অপেক্ষা না রেখেই। এবং সংস্কৃত পণ্ডিতেরা হিন্দু ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি-মূলক খাটি সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থই কেবল পাঠ করেন—Buddhist Hybrid Sanskrit বা, অর্থাৎ ঐ পূর্বোক্ত ছয়শত বৎসরে পাণিনির আধিপত্য এড়িয়ে যে সংস্কৃত ভাষা প্রচারিত হয়েছিল এবং নিখিল বিশ্ব যার অমিয় স্থাপানে তথাগতমহিমসুধা পান করে ধন্ত হয়েছেন—সেই পালিপ্রাকৃতমিশ্র অপাণিনীয় সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থ বিষয়ে তাঁরা কিছুই অবগত নন। ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে আমরা ভগবান তথাগত সম্বন্ধেও জানি Paul Caras, Sir Eddwin Arnold বা Rhys Davidsর বই পড়ে—তা'ও সে জ্ঞান তাঁদেরই সম্ভব, ধারা ইংরেজী জানেন, অন্তদের পক্ষে নয়। এই সব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বা এই সকল গ্রন্থ প্রভাবিত গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের ঐ যুগের বৌদ্ধ গ্রন্থের বিষয়ে জানতে হয় এটি পরিতাপের বিষয়।

অন্যদিকে এই সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য এত ব্যাপক ও বিরাট এবং মহামহিমপূর্ণ যে সে সম্বন্ধে চিন্তা করলে বিশ্বয়ে অভিভূত হ'তে হয়। এই বিশাল সাহিত্য পাঠে এই ধারণা অবশ্য হতে বাধ্য যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়নি, বরং হিন্দু ধর্মের বিশাল আবেষ্টনের সমধিক অংশ অধিকার করে সর্বোত্তম বিরাজ করছে।

এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের আদিভাষা সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, গাথা—তাদের মধ্যে আপেক্ষিক সম্পর্ক, অথবা, হীনযান, মহাযান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো না। মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, নেপাল প্রভৃতি দেশে যে সকল সংস্কৃত পুস্তক বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করেছে, সে সকল কোন্ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাও আলোচনা এখানে সম্ভবপর হবে না। তবে মোটামুটি বলা যায় যে সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ অধিকাংশই মহাযানানুগ।

আলোচনার সৌকর্যার্থ আমরা এ বিরাট সাহিত্যকে এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিচ্ছি :—

- (১) অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য
- (২) অশ্বঘোষ ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্যমহারথগণ।
- (৩) অবদান-সাহিত্য
- (৪) মহাবৈপুল্য-সূত্র
- (৫) সংস্কৃতে রচিত অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ-গ্রন্থ।
- (৬) মাহাভাষ্য, স্তোত্র, ধারণী ও তন্ত্র ॥

(১) অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ॥

এই যুগের দুটি বিশিষ্টতম গ্রন্থ—(ক) মহাবল্লভ ও (খ) ললিতবিস্তর।

(ক) মহাবল্লভ ॥

মহাবল্লভ ভগবান্ বুদ্ধের মহাজীবনের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার এক অপূর্ব বিবরণ—ফলতঃ, এটি একটি অবদান-গ্রন্থ। মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের

অন্তর্ভুক্ত লোকোত্তরবাদীদের উক্ত অল্পসারে এই গ্রন্থ বিনয়-পিটকের অন্তর্গত। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানবস্থা, জন্ম, অভিনিষ্কমণ, বোধিলাভ—প্রভৃতির বিষয়ে লোকোত্তর লীলাকাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে।

মহাবস্তু মহাগ্রন্থ তিনভাগে বিভক্ত—এ তিনটি ভাগ ঠিক নিদানকথার পর্যায়াবলম্বী। প্রথমভাগে দূর-নিদান অর্থাৎ আদিকাল থেকে ভূষিত স্বর্গে অবস্থানকাল পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী; দ্বিতীয় ভাগে দূর-নিদানের ঘটনাবলী—ভূষিত স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্কমণ পর্যন্ত জীবনকাহিনী। তৃতীয় খণ্ডে তার পরবর্তী বা বুদ্ধের উত্তরজীবনের ঘটনাবলী।

মহাবস্তু-অবদান গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে মিশ্র সংস্কৃতভাষায় লিখিত। ও গ্রন্থের বহুল মৌলিক অংশ আমার “বুদ্ধলীলাসঙ্গিনী জননী যশোধরা”, নামক গ্রন্থে সমৃদ্ধ হইয়াছে। তজ্জগৎ এখানে উদাহরণস্বরূপ কোন অংশ উদ্ধৃত করা হ'লো না।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে অনেক বিষয় ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারে এখানে লিপিবদ্ধ আছে (যেমন রাহুলের প্রব্রজ্যা গ্রহণ)। আবার শ্লোকাংশে গদ্যাংশের অনেক ঘটনাই পুনরুল্লিখিত হয়েছে। অথচ রচনার প্রকৃতি ও ভাষার তুলনায় এটি স্বভাবতই প্রতীত হয় যে গাথাংশ গদ্যাংশ থেকে সমধিক প্রাচীন। মহাবস্তুতেও বহু জাতকও সংগ্রথিত আছে এবং এখানে অনেক জাতক আছে—যা মূল জাতক-গ্রন্থে নেই—উদাহরণ পুনরায় “বুদ্ধদেবলীলাসঙ্গিনী জননী যশোধরা” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রপঞ্চিত শাক্যসিংহের বিষয়ে জননী যশোধরার প্রতিশোধগ্রহণমূলক মনোভাব প্রভৃতি বিষয় স্থানান্তরে দৃষ্ট হয় না। যশোধরার মনোনিয়নাদি ব্যাপার ও অনেক নূতন বিষয়ের সমাবেশ এ গ্রন্থে আছে।

সংযুক্ত-নিকায়ের প্রথমাংশে আছে—“ইখীপিহি একচ্চী যা সেয্যো পোসা, জনাখি। মেধাবতী লীলাবতী—” অর্থাৎ এমন নারী আছেন যারা মেধা ও

শীলের দিক থেকে পুরুষের থেকে উন্নততর।” বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৬, ৪, ১৭) বলেছেন—“অথ য ইচ্ছেদুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত, নৰ্বমায়ুরিয়াদিতি...” ইত্যাদি—যিনি আয়ুষ্কামী পণ্ডিতা দুহিতা চাইবেন—তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন করে দুহিতু-রত্ন লাভ করতে হবে। শীলবতী মেধাবতী পণ্ডিতা দুহিতা যশোধরাকে লাভ করার জন্য মহানামের সাধনার অন্ত ছিল না। এ কন্টারত্নকে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী কুমারকে পর্যন্ত সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। জননী যশোধরার একান্ত বলবতী ইচ্ছাই পরে ফলপ্রসূ হয়। ললিতবিস্তর ও গোপা—যশোধরা ভদ্রকচ্ছা বিশ্বাদেবী রাহুলমাতার যশোগান করেছেন অনেক। কিন্তু মহাবস্ত-অবদানের অঙ্কনে সিদ্ধার্থ-যশোধরার জন্ম-জন্মান্তরের মিলন-বিরহের পরিপ্রেক্ষিতে যে অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—তা’ যেন ললিতবিস্তরে নেই। তবে নিগূঢ় বিশ্লেষণে কোনও সন্দেহ থাকে না যে দণ্ডপাণিস্থতা গোপা ও মহানামদুহিতা যশোধরা সত্যিই ভদ্রকচ্ছা বিশ্বাদেবী—ললিতবিস্তরে উক্ত জননীর ঘটনাবলী জন্ম-জন্মান্তরের বৃত্তান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অপূর্ব সৌন্দর্যমাধুর্যে বৃহত্তর আলেখ্যে পরিমুর্চিত হয়ে উঠেছে মহাবস্ত-অবদানে।

মহাবস্ত-অবদানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে বোধিসত্ত্বের অপূর্ব আত্মত্যাগ, মৈত্রীসাধনবিষয়ক যে সকল কাহিনী আছে, সেগুলি পালি গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

এই গ্রন্থের মৌলিক অংশ খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হয়েছিল।

(খ) ললিতবিস্তর ॥

ললিতবিস্তর বৈপুল্যসুত্রের অন্তর্গত—মহাবান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। তা হলেও এটি কম আশ্চর্যের বিষয় নয় যে এ গ্রন্থ প্রথমে সর্বাঙ্গবাদ হীনযানের গ্রন্থ ছিল। ললিত অর্থে লীলা; ললিত-বিস্তর অর্থ ভগবান্ বুদ্ধের লীলা-কাহিনীর বর্ণন।

ললিতবিস্তরে ভগবান্ বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে, যা' অত্র কোনও প্রাচীন গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। যথা, অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত মাতৃদ্বন্দ্বার সঙ্গে বুদ্ধদেবের মন্দিরে গমন বৃত্তান্ত বা দশম অধ্যায়ে বর্ণিত বোধিসত্ত্বের পাঠশালায় প্রথম দিনের ঘটনাবলী। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়েও অনেক বিষয় আছে—যা' স্থানান্তরে পাওয়া যায় না।

এটি অবশ্য সত্য নয় ললিতবিস্তর সর্বাংশে সর্বতোভাবে বৌদ্ধধর্মবিষয়ক সর্বপ্রাচীনতম মতাবলীর বা ঘটনাবলীর আকর। তা হলেও এ গ্রন্থ থেকে বৌদ্ধ কাহিনী, আখ্যায়িকা প্রভৃতি কিভাবে পরিপূর্তি লাভ করেছে, তার একটি মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থেই বলা আছে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গীতি কালে এ গ্রন্থ বিরচিত হয়।

তা' থেকে এটি অনায়াসে বলা চলে—ললিতবিস্তর গ্রন্থ নিশ্চয় খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে বিরচিত হয়েছিল—খ্রীষ্টের জন্মের পরবর্তী গ্রন্থ এটি নয়।

(২) অশ্বঘোষ ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্যমহারথগণ

অশ্বঘোষ

অশ্বঘোষ মহাযানীয় মতাবলীর প্রপঞ্চকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সম্বন্ধে কথিত আছে যে এমন কোনও ছোটল প্রশ্ন ছিল না, যার উত্তর তিনি দিতে পারতেন না; এমন কোনও অভিযোগ ঘটতে পারতো না যার তিনি স্বযুক্তি-পূর্ণ মীমাংসা করতে পারতেন না; এমন কোনও বাদী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না যাকে তিনি,—ভীম প্রভঞ্জন যেমন বিপুল বৃক্ষকে ধ্বংসিত করে, তেমনি—সম্পূর্ণভাবে পরাভূত না করতেন। ইংসিং অশ্বঘোষকে নাগার্জুন ও দেবের সমপর্যায়যুক্ত করে বলেছেন যে এই প্রকারের মনীষী পুরুষ পরম্পরায় ছ' একজনের বেশি ধরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন না।

অশ্বঘোষ বুদ্ধ-চরিত, সৌন্দর্যানন্দ-কাব্য, গণ্ডীস্তোত্রগাথা এবং সারিপুত্র প্রকরণের রচয়িতা। বজ্রহুচী নামক একটি গ্রন্থও তাঁর নামে চলে। এই

বজ্রহুটী গ্রন্থ বেদ, মহাভারত, মনুসংহিতার বর্ণধর্মবিষয়ক মতাবলীকে বর্ণপ্রথার বিরোধী মতরূপে উপস্থাপিত করেছে যুক্তিতর্ক সহ। এই পুস্তক মৈত্রীমুখে উচ্চ নীচ সকলের মধ্যে ভেদের রাহিত্য করেছে ঘোষণা; এবং ব্যবসারে, জন্মমৃত্যু সর্ব বিষয়ে সকলের সমান স্থান নির্দেশ করেছে। শ্রুতালঙ্কার নামক গ্রন্থটি, চীনদেশীয় গ্রন্থকারদের মতে—অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত—ফলতঃ এই গ্রন্থ কুমারলাত রচিত বলে মনে হয়। (১) শ্রুতালঙ্কারের অপর নাম কল্পনা-মণ্ডিতিকা বা কল্পনালঙ্কৃতিকা। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সংস্কৃত গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র এখন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ জাতক ও অবদানের সংগ্রহ বিশেষ—পদ্ম ও গন্ধের সংমিশ্রণে বিরচিত। রাজা কনিষ্ক সম্বন্ধে যে দুটি কাহিনী আছে, তাতে তাঁকে অতীতের রাজা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। হয়েছে সাং'র মতে কুমারলাত নৌজাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই শ্রুতালঙ্কার গ্রন্থে সাংখ্য-বৈশেষিক, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মতবাদের বিশেষ খণ্ডন পরিদৃষ্ট হয়। এ গ্রন্থের আর বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়—লিপি, শিল্প, চিত্রবিদ্যার আলোচনা।

মাতৃচেট ॥

মাতৃচেট রাজা কনিষ্কের সভাকবি ছিলেন। তাঁর রচিত চতুঃশতক-স্তোত্র (চারিশত শ্লোকের সমাহার) বা বর্ণাই-বর্ণ-স্তোত্র খণ্ডিতভাবে পাওয়া যায়। (২) Bstan hgyur র Tohoku Catalogue এ মাতৃচেটের নামে নিম্নলিখিত রচনা পরিদৃষ্ট হয়:—

- নং ১১৩৮ বর্ণাই-বর্ণ-স্তোত্র
- ” ১১৩৯ ত্রিপুরমঙ্গল-স্তোত্র
- ” ১১৪০ সম্যকসংবুদ্ধ লক্ষণ স্তোত্র

(১) Ed. S. Levi

(২) Fragmentary Mss. in Berlin Academy of Sciences. কিয়দংশ Hoernle's 'Manuscript Remains'এ প্রকাশিত হয়েছে; পৃষ্ঠা ৭৩ হতে। অবশিষ্টাংশ কেবল Bstan hgyur এ প্রাপ্য।

- ” ১১৪১ একোত্তরিক স্তব
- ” ১১৪২ সুগতপঞ্চজিংশং স্তোত্র
- ” ১১৪৪ জিরত্সস্তোত্র
- ” ১১৪৭ শতপঞ্চাশৎকনাম স্তোত্র (১)
- ” ১৭০৩ আৰ্যতারাদেবী স্তোত্র সর্বার্থনিদ্দিনাম-স্তোত্ররাজ
- ” ২৩৬২ মাতৃচেষ্ট-গীত
- ” ৩৬২৩ আৰ্যতারি স্তোত্র
- ” ৪১৬২ ও ৪৫১২ চতুর্বিপর্ষয় কথা
- ” ৪১৭০ ও ৪৫১৩ কলিযুগপরিকথা
- ” ৪১৮৪ ও ৪৪২৮ মহারাজকনিষ্কলেখ

কলিযুগপরিকথায় বর্তমান কলিযুগের এবং মহারাজকনিষ্কলেখে জীবনের দুঃখদৈন্ত, বঞ্চনার বর্ণনা আছে।

চতুঃশতকস্তোত্র এবং শতপঞ্চাশৎকস্তোত্র সঙ্কল্পে ইং-সিং বলেছেন হীনযান ও মহাযান সর্বসম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরাই এই স্তোত্রদ্বয়ের রসগ্রাহী ছিলেন এবং এ রচনা অতুলনীয় বলে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করতেন। তিনি এখানকার শ্লোকসমূহকে স্বর্গীয় পুষ্পদানের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন এখানকার প্রপঞ্চিত মতবাদ পর্বতের উত্ত্বলশৃঙ্গরাজিকে অতিক্রম করে আরো অগ্রসর হয়ে যায়। তাঁর মতে বোধিসত্ত্ব অসঙ্গ এবং বহুবদ্ধ মাতৃচেষ্টের সাতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তিনি এই রচনাদ্বয়ের বহু টীকাটিপ্পনীর বিষয়ে

(১) শতপঞ্চাশৎকনামস্তোত্র Journal of Behar Orissa Research Societyর vol. XXiii (1937), pt. IV এ প্রকাশিত হয়েছে। Hoernle's Manuscript Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan (1916), পৃ: ৫৮—দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থের টীকার নন্দিত্রিয় কর্তৃক তিব্বতী ভাষায় অলুবাদ Bstan hgyur, Bstod tshogs, foll. 128 b—196 b দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ করেছেন। মহামহিম দিঙ্‌নাগও ১৫০টি কবিতা রচনা করে “শত-পঞ্চাশংক-স্তোত্র”-এর প্রতি কবিতার প্রারম্ভে স্বকীয় একটি কবিতা সংস্থাপন-পূর্বক “মিশ্রক স্তোত্র” রচনা করেছেন। তদনন্তর মুগদাবের শাক্যদেব নামক একজন ভিক্ষু আরো ১৫০টি রচনা পূর্বক এই কবিতাগুলিকে ৪৫০ শ্লোকাত্মক করে তুলেছেন এবং “বারদ্বয়বিবর্ধিত স্তোত্র” নামে স্বীয় রচনাকে অভিহিত করেছেন। (১)

এই যুগের অত্যন্ত বিশিষ্ট রচনা বৈভাষিক আর্ঘচন্দ্র রচিত মৈত্রেয় ব্যাকরণ বা মৈত্রেয় সমিতি। (২) এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাত্ত বিষয়--মৈত্রেয় বুদ্ধের সময় পৃথিবীতে স্বর্গধাম বিরচন।

আর্ঘশূরের জাতকমালায় “জাতক” গ্রন্থ ব্যতিরিক্ত নূতন কোনও জাতক নেই। এই গ্রন্থে ৩৪টি জাতক স্নন্দর ভাষায় গদ্য ও পদ্যে পুনর্লিখিত হয়েছে। বোধিসত্ত্বের “পারমিতা”ই এদের উদ্দিষ্ট বিষয়। এ গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব দিব্য লাভণ্যে প্রকটিত হয়েছেন। খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আর্ঘশূর জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন। অজন্তার গুহাসমূহের চিত্রাবলীতে আর্ঘশূরের জাতকমালার শ্লোকাবলী পরিদৃষ্ট হয়। (৩) বুদ্ধঘোষের “পদ্মচূড়ামণি”র নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। (৪)

(১) বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে মাতৃচৈট প্রথমে শিবের উপাসক ছিলেন এবং পরে নালান্দায় নাগার্জুনশিষ্য আর্ঘদেব কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

(২) এই গ্রন্থের একটি অসম্পূর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। অত্র পুঁথির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

(৩) Harvard Oriental Series এর প্রথম পুস্তকরূপে H. Kern সংশোধিত “জাতকমালা” ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

(৪) Madras Govt. Oriental Seriesর পুস্তক Kuppaswami Shastri কর্তৃক সংশোধিত। এ গ্রন্থ ভগবান বুদ্ধের অপূর্ব জীবনচরিত। এ গ্রন্থ অতি সুখপাঠ্য ও সারগর্ভ।

(৩) অবদান গ্রন্থমালা

মহাবস্তু ললিতবিস্তরের মত সংস্কৃত বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থমালাও হীনযান ও মহাযান উভয় পক্ষের কারো সম্পূর্ণ অমূল্য বা প্রতিকূল নয়। প্রথম দিকের অবদান গ্রন্থসমূহ অধিকতর হীনযানভাবাপন্ন ছিল ; কিন্তু পরবর্তী অবদান গ্রন্থনিচয় সমধিক মহাযানাশ্রয়ী। এই বিশিষ্ট বীরোচিত কর্মাবলী সংবলিত গ্রন্থনিচয় এই সত্যই প্রচারিত করে যে নিকাম কর্ম বা যে কোনও পুণ্য কাজ, ভাল কাজের ফল অনিবার্যভাবেই সংফলপ্রদ এবং অন্তায় কাজের অবশুষ্ঠাবী ফলই হলো অমঙ্গল, অকল্যাণ। এবং এই কর্মনন্ততি জন্ম-জন্মান্তরপ্রবাহী। পূর্ণ “অবদান” অতীত ও বর্তমানব্যাপী এবং এর উপদেশপ্রবণতা সুপ্রত্যক্ষ।

এই শ্রেণীর অর্থাৎ অবদান শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে হীনযান সর্বাঙ্গীয়াদিগণের “অবদানশতক”ই খুব সম্ভবতঃ সর্বপ্রাচীন। (১) বোধিসত্ত্ব মতবাদের অভ্যুত্থান এই গ্রন্থ-বিরচন সময়ে হয়নি ; কিন্তু এখানে বুদ্ধ-ভক্তি অতি সুপ্রকট। এ গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা বলেই মনে হয়। এই গ্রন্থে দশটি বগ্গ ; তন্মধ্যে প্রথম চারিটিতে বুদ্ধ বা প্রত্যেকবুদ্ধে পরিগণিত হওয়ার নিমিত্ত করণীয় কর্তব্যনিচয়ের সমুল্লেখ ও পর্যালোচনা আছে। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী ‘ব্যাকরণ’ বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এ গ্রন্থের প্রত্যেক অবদানগ্রন্থের প্রথমাংশের ভাষা এক এবং সমস্ত গ্রন্থের রচনানৈলী সুনির্দিষ্ট গতাগতিকমার্গাহুগ।

দিব্যাবদান (২) গ্রন্থের প্রাথমিক ও পরবর্তী অংশ বিনির্গম্য দুঃসাধ্য নয় এবং তজ্জগৎ এ গ্রন্থে বিষয়-সন্নিবেশে অসামঞ্জস্য বা বিশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয়। এ গ্রন্থের প্রাথমিক পর্যায়ের রচনা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী ; চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী রচনাও এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এই

(১) Ed. by Speyer in Bibliotheca Buddhica.

(২) Ed. by Cowell and Neill, Cambridge.

গ্রন্থের অন্তর্গত শাদুল-কর্ণাবদান খ্রীষ্টীয় ২৬৫ সালে চীন ভাষায় অনূদিত হয়। এই শাদুল-কর্ণাবদান রবীন্দ্র নাথের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কল্পজন্মাবদানমালা, অশোকাবদানমালা প্রভৃতি গ্রন্থও আমাদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। দ্বাবিংশত্যবদান বাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বিষয়বস্তু অনেকাংশে অবদানশতকের তুল্য। ভদ্রকল্পাবদানে উপগুপ্ত সম্রাট অশোকের নিকট বত্রিশটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

অবদানের মধ্যে অনেক মাহাত্ম্য, ব্রত প্রভৃতির বর্ণনাও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ব্রতাবদানমালার নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে এই অধ্যায়ে ক্ষেমেন্দ্রের অবদান-কল্পলতার নাম করছি; কিন্তু এই গ্রন্থের আকারও যেমন বিপুল, গাভীরও সে পরিমাণে সমধিক। খ্রীষ্টীয় ১০৫২ সালে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। এবং এই গ্রন্থে ১০৮টি অবদানের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র-পুত্র সোমেন্দ্রেরও একটি অবদান আছে। ক্ষেমেন্দ্রের প্রার্থনা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে।

যাবদ্ ভূভূঁরিভূভূংক্ষতনলিলচলআলিকা শেষশীর্ষে

মায়ুরচ্ছত্রশোভামনুভবতি ফণারত্নরশ্মিপ্রতানৈঃ।

ধত্তে যাবৎ স্তমেকঃ ক্ষিতিতলকমলে কর্ণিকাকারকাস্তিঃ

শাস্তস্তাবৎ কথেন্ন কলয়তু জগতাং কর্ণপূরপ্রতিষ্ঠাম্ ॥

(৪) মহাযানসূত্র বা মহাবৈপুল্যসূত্র

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথমের দিকে হীনযান গ্রন্থ কিছু ছিল এবং কিছুকাল গ্রন্থ হীনযান-মহাযান মধ্যবর্তী পথের অল্পবর্তী ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য মহাযান গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। মহাবৈপুল্য সূত্রগুলির মধ্যে উভয় যানের প্রতিই দৃষ্টি রয়েছে, যদিও মহাযানের দিকেই এ গ্রন্থনিচয়ের আকর্ষণ সমধিক।

এই নববৈপুল্যসূত্রের নাম যথাক্রমে (১) অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা; (২) সদ্ধর্মপুণ্ডরীক; (৩) ললিতবিস্তর; (৪) লঙ্কাবতার; (৫) স্তবর্ণ-

প্রভাস; (৬) গণ্ডব্যূহ; (৭) তথাগত-গুহ্যক; (৮) সমাধিরাজ ও (৯) দশভূমীশ্বর।

(১) এর মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা দার্শনিক গ্রন্থ। বোধিসত্ত্বের মহিমময় পরিপূর্ণতা বিষয়ক এই গ্রন্থ। প্রজ্ঞাপারমিতাই ষড়্বিধ পারমিতার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের। খ্রীষ্টীয় ১৭৯ সালে এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়; খুব সম্ভবতঃ, এই গ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতেই বিরচিত হয়েছিল।

বিভিন্ন প্রজ্ঞাপারমিতার আকৃতি বৈষম্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কারণ সওয়া লক্ষ শ্লোক পরিমিত প্রজ্ঞাপারমিতা যেমন একদিকে আছে, অত্রদিকে তেমনি আট হাজার শ্লোকে রচিত প্রজ্ঞাপারমিতাও আছে, ১৫০ শ্লোক পরিমিত প্রজ্ঞাপারমিতাও আছে। ইয়েন সাং ১১ ব্রহ্মের প্রজ্ঞাপারমিতার অনুবাদ করেছিলেন, ভগ্নমধ্যে লঘুতম আকৃতির প্রজ্ঞাপারমিতা দেড়শত শ্লোকবিশিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত বজ্রচ্ছেদিক প্রজ্ঞাপারমিতা, অল্লাক্ষরপ্রজ্ঞাপারমিতা এবং প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্রও রয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থ “ধারণী”রূপে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতাই সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলে মনে হয়।

(২) সদ্ধর্মপুণ্ডরীক। এই গ্রন্থই মহাযানসূত্রের মধ্যে প্রাচীনতম। এখানে বুদ্ধদেবের অলৌকিকত্বের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের মতে যে সকল সাধক ভগবান বুদ্ধের পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন, তাঁরা নিশ্চয় পরিপূর্ণ নির্বাণপ্রাপ্ত হবেন। শিষ্য, প্রত্যেকবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব—সকলেই ক্রমোন্নতি লাভ করে নির্বাণেই পরিসমাপ্তি লাভ করতে পারেন।

নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি সদ্ধর্মপুণ্ডরীক গ্রন্থ থেকে বাক্যাবলী উদ্ধৃত করেছেন। কাজেই এই গ্রন্থ তার পূর্বেই রচিত হয়েছিল। এ গ্রন্থ চীনভাষায় সর্বপ্রথম অনূদিত হয় ২২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৎপরে ধর্মরক্ষের অনুবাদ ২৮৬ সাল, কুমারজীবের অনুবাদ ৪০০ এবং জ্ঞানগুপ্ত ও ধর্মগুপ্তের অনুবাদ ৬০১ সালে রচিত হয়। এই গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ

পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধভক্তিই এই গ্রন্থের মূল ভিত্তি। বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন, বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা বিশেষভাবে এ গ্রন্থে উপদিষ্ট হয়েছে। এবং চীন ও জাপানে এ গ্রন্থের প্রভাবই সর্বাধিক।

(৩) ললিতবিস্তরের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

(৪) লঙ্কাবতার। অর্থাৎ লঙ্কায় সদ্ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অবতারণা। এই গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয় বিজ্ঞান-বাদ। এই গ্রন্থ, খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত হয় এবং চীন ভাষায় খ্রীষ্টীয় ৪৪৩ সালে গুণভদ্র, ৫১৩ সালে বোধিকুটি এবং ৭০০-৭০৪ সালে শিক্কানন্দ এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

(৫) স্ববর্ণ-প্রভাস। নীতি ও দর্শনমূলক এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কাহিনী এবং তত্ত্বোক্ত বিষয়ও কিছু কিছু আছে।

(৬) গণ্ডব্যূহ। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর উপদেশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আহরণের জন্য স্বধন নামক কোনও যুবকের নিখিল ভারত পরিক্রমার বিষয় এই গ্রন্থে বিবৃত আছে। এই গ্রন্থের অন্তে দোধক ছন্দের ৬২টি শ্লোকে রচিত ভদ্রচরিত্র-প্রণিধানগাথা নামক একটি স্তোত্র আছে। এই স্তোত্রটি বৌদ্ধস্তোত্র-সমূহের সমস্ত শ্রেষ্ঠ স্তোত্র বলে সুপ্রসিদ্ধ।

(৭) তথাগত-গুহ্যক। এটি তন্ত্রশ্রেণীর গ্রন্থ। ফলতঃ, ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্র ও ধ্যানবিশেষের সমন্বয়। এই গ্রন্থে আঠারটি অধ্যায়— কিছু গাথা ও কিছু অংশ সংস্কৃতে রচিত।

(৮) সমাধিরাজ। কি প্রকারে বৌদ্ধ ভক্ত উত্তরোত্তর উচ্চ সোপানে আরুঢ় হয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধি লাভে সমর্থ হতে পারে, এ গ্রন্থে তারি আলোচনা।

(৯) দশভূমীশ্বর। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বোধিসত্ত্ব যে দশটি ভূমি ক্রমান্বয়ে উত্তরণ করতে বাধ্য হয়, এ গ্রন্থে তারি আলোচনা প্রমুদিতা, বিমলা প্রভাকরী, অর্চিসমতী, সুহৃৎস্বয়ং, অভিমুক্তি, দুর্জয়, অচল, সাধুমতি এবং ধর্মমধ্য—এই দশটিই ভূমি।

(৫) সংস্কৃতে রচিত অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থ ॥

নাগার্জুন মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মহাব্যানশূত্রের “শূন্যবাদ” তিনিই তাঁর মাধ্যমিক শূত্র বা মাধ্যমিক-কারিকায় স্পষ্টভাবে প্রপঞ্চিত করেন। এ গ্রন্থে চারিশত কারিকা; এবং নাগার্জুন নিজেই এই চারিশত কারিকার টীকা রচনা করেছেন—টীকাটির নাম অকুতোভয়া। কিন্তু এই টীকার সংস্কৃত মূল চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। নাগার্জুন এবং তার শিষ্য আর্যদেব প্রপঞ্চিত মাধ্যমিক মতবাদের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা চন্দ্রকীর্তির “প্রসঙ্গপদা” নামক সংস্কৃত টীকা ব্যতীত মাধ্যমিক শূত্রের আর কোন টীকা এখন আর পাওয়া যায় না। নাগার্জুন প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদ তাঁর যুক্তি-যান্ত্রিকা এবং শূন্যতা-সমুত্তি নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয়েও প্রপঞ্চিত করেছেন। সপ্ত অর্ধাঙ্কদে গ্রথিত প্রতীত্য-সমুৎপাদ-হৃদয় এবং মহাব্যান-বিংশক নামক গ্রন্থও নাগার্জুন-বিরচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। খুব সম্ভবতঃ, স্কন্ধগোথ নাগার্জুনেরই রচিত। প্রজ্ঞাপারমিতা-শূত্রশাস্ত্র এবং দশ ভূমি-বিভাষ-শূত্র তাঁর গ্রন্থ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

নাগার্জুনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য আর্যদেব। আর্যদেব চতুঃশতক গ্রন্থের রচয়িতা এবং চন্দ্রকীর্তি এই গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেছেন। চতুঃশতক এবং এই গ্রন্থের টীকাই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আর্যদেব হিন্দু ষড়দর্শন খণ্ডন করার প্রচেষ্টা করেছেন; বিশেষতঃ বৈশেষিকদর্শনের মূলোৎপাটনের জন্তু তিনি বদ্ধপরিকর। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য বৌদ্ধ মতেরও খণ্ডনপূর্বক তিনি তাঁর গুরু নাগার্জুনের মতই স্থাপনের জন্তু স্বর্গ মর্ত্য আলোড়ন করেছেন।

চিন্তা-বিশুদ্ধি-প্রকরণ নীতিমূলক কবিতা গ্রন্থ। এতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর সমালোচনা আছে। এই গ্রন্থের লেখক আর্যদেব পূর্বোক্ত আর্যদেব থেকে ভিন্ন কি না, তা’ চিত্তনীয়।

যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, খুব সম্ভবতঃ মৈত্রেয়নাথ, তাঁর শিষ্য অসঙ্গ বা আর্যাসঙ্গ নন। এই সম্প্রদায় “বিজ্ঞানবাদ”-এর প্রপঞ্চক। এই

সম্প্রদায়ের মতে যোগের মাধ্যমেই যোগাচার সাধক ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্বের উত্তরগীয় দশ ভূমি অতিক্রম করে “বোধি” বা নির্বাণ লাভে সমর্থ হন, অন্য কেউ নয়। অভিসময়ালঙ্কার মৈত্রেয়নাথের বিশিষ্টতম গ্রন্থ। এবং মহাবান-সুত্রালঙ্কারও তাঁরই গ্রন্থ বলে মনে হয়, যদিও অসঙ্গের নামেও এই গ্রন্থ প্রচলিত। অসঙ্গ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যোগাচারভূমিশাস্ত্র নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বসুবন্ধু অসঙ্গের প্রখ্যাত গ্রন্থ অভিধর্মকোশমূল সংস্কৃতে এখন আর পাওয়া যায় না; সৌভাগ্যক্রমে যশোমিত্র-কৃত টীকার সংস্কৃত মূল নষ্ট হয়নি। বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক বৌদ্ধগণের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের উপর এই গ্রন্থ বিশেষ আলোকসম্পাত করে। বৌদ্ধ মতবাদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। অভিধর্মে বসুবন্ধু বৈশেষিক মতবাদ এবং পরমার্থ-সম্পত্তিতে সাংখ্যদর্শন বিশেষভাবে খণ্ডন মুণ্ডনের চেষ্টা করেছেন।

(৬) মাহাঅ্য, স্তোত্র, ধারণী ও তন্ত্র ॥

মাহাঅ্য

হিন্দু-পুরাণসমূহের আদর্শে বিরচিত স্বয়ম্ভুপুরাণ বাস্তবিকপক্ষে অনেক পরবর্তীকালের গ্রন্থ। এই গ্রন্থ একটি “মাহাঅ্য” বিশেষ—নেপালের ষাবতীয় তীর্থস্থানের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

স্তোত্র

সম্রাট শ্রীহর্ষবর্ধনের নামে এতদিন তিনটি নাটক মাত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু সুপ্রভাত-স্তোত্র এবং অষ্টমহাশ্রীচৈত্য স্তোত্রের আবিষ্কারের ফলে এখন সুপ্রভাত হইছে যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পরে তিনি বৌদ্ধমতবাদপ্রপঞ্চন মূলক রচনাও কিছু করেছিলেন।

একশত শ্লোকে বজ্রদন্ত তাঁর লোকেশ্বরশতক রচনা করেন প্রসিদ্ধি আছে যে এই রচনার সাহায্যে তিনি অবলোকিতেশ্বরের কৃপায় কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য—এইরূপ প্রসিদ্ধি হর্ষবর্ধনের হৃদয়

শ্রেষ্ঠ সভাকবির নামেও প্রচলিত আছে। যেমন, বাণভট্ট তাঁর শাপমুক্তির জন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীশতক রচনা করেছিলেন এবং ময়ূরভট্ট তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সূর্যশতক রচনা করেছিলেন সূর্য্যদেবের অল্পগ্রহে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্তু। বঙ্গদত্ত খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন; অন্ততঃ বঙ্গদেশে লালিত পালিত ছিলেন তিনি—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—তার কারণ, তিনি বঙ্গেশ্বর দেবপালের সভাকবি ছিলেন।

রামচন্দ্র কবিভারতীর গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবাস্থিত। তিনি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১২৪৫ সালে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করে সিংহলে যান এবং সেখানে সিংহলরাজ পরাক্রমবাহুর বিশেষ সমাদর লাভ করেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ-ভক্তির একটা অপূর্ব অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এই বৌদ্ধভক্তি কৃষ্ণভক্তি বা শিবভক্তিরই নামান্তর মাত্র।

এই গ্রন্থ সেই যুগের একজন ভক্ত বৈষ্ণব বাঙ্গালী রচনা করেছিলেন, যে যুগের কবি বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

“নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ! শ্রুতিজাতং

সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং

কেশবধ্বতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে”

অর্থাৎ হে জগদীশ হরে! তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করে যজ্ঞবিধিমূলক যে শ্রুতিসমূহের নিন্দা করেছিলে—যাতে পশুবলি বিহিত আছে: তা’ তোমার করুণাঘন হৃদয় প্রস্রবণেরই চোতক—কৃষ্ণের এই অবতাররূপ—বুদ্ধরূপ। এই বুদ্ধদেবরূপ হরির জয় হোক ॥

ঠিক সেই যুগের আর ভক্ত বৌদ্ধ কবি মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন—

“জ্ঞানং যশ্চ সমস্তবস্তুবিষয়ং যশ্চানবজ্ঞং বচো

যস্মিন্ রাগলবোহপি নৈব ন পুনর্দেষো ন মোহস্তথা।

যশ্চাহেতুরনন্তসদ্ব্যখদাহনম্না রূপামাধুরী

বুদ্ধো বা গিরিশোহথবা স ভগবান্শাস্ত্রৈ নমস্কর্য্যহে”

এটি ভক্তি শতকের প্রথম কবিতা। তাতেই পরম বৌদ্ধ ভক্তকবি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—“সমস্ত পদার্থের বিষয় বীর জ্ঞান, বীর বাক্য অনবদ্য, বীর আসক্তির কণাটুকু পর্যন্ত নেই—বেশ অথবা মোহ তো নয়ই—বীর ক্রপামাধুরী কোনও হেতু নেই অথচ অনন্ত সুখ প্রদান করে এবং অজস্র ধারে বণিত হয়—সেই ভগবানকে আমরা প্রণতি নিবেদন করি—তিনি বুদ্ধই হোন আর শিবই হোন।

আর একটু অগ্রসর হয়ে এই অনবদ্য ভক্তিবাদী পরম সাধক বাঙ্গালী বৌদ্ধ কবি বলছেন—

“শরণমিতি সদগ্রং সাধু গচ্ছামি বুদ্ধং
 শরণমিতি বিরাগাগ্রীয়ময়েমি ধর্মম।
 শরণমিতি গণানামগ্রিমং যামি সজ্জং
 শরণমিতি পুনস্ত্রীন্ দ্বিপ্রিবারং ব্রজামি ॥” ১২

এখানে কবি বুদ্ধদেব, তাঁর ধর্ম ও সজ্জের মহামহিমা কীর্তন করেছেন।

তারপর তিনি কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন, তৎসম্পর্কে তিনি বলছেন, বংশপরম্পরাক্রমে তিনি বৌদ্ধ নন—তিনি নিজেই বৌদ্ধ কেন—লাভের জন্ত নয়, ভয়ের জন্তও নয়, সংকীতির বাসনাতেও নয়। কিন্তু ‘ভগবন্ বুদ্ধ! তুমি সূর্যবংশপ্রভব বলেও নয়, অথবা তোমার বিদ্যাবুদ্ধিও নয়। কিন্তু সর্বজনসাধারণের প্রতি তোমার যে অপূর্ব করুণা, তোমার “সার্বজন্য”—তোমার সমাগ্ জ্ঞান দেখে, আমি ভবসাগর তোমার সাহায্যে পার হওয়ার জন্ত প্রবৃত্ত হয়েছি’—

“নাহং লাভাদর্চনার্থী ন চ ভয়চকিতো নাপি সংকীতিকামো
 ন ত্বং বর্মাণ্ডবংশপ্রভব ইতি মুনে নাপি বিদ্যাশয়া তে।
 পারম্পর্যায় চ ত্বাং শরণমুপগতঃ কিন্তু তে সার্বজন্যং
 সমাগ্ জ্ঞানং সমীক্ষ্য স্মি ভবজলধিঃ সন্তরীতুং প্রবৃত্তঃ ॥” ২৪

কবি আরো বলছেন যে তিনি বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য, সমস্ত ভূতকরুণা এবং

প্রজ্ঞাদি নানাগুণস্থভাষিত চন্দনপঙ্কের সমুদ্রে পতিত অশ্রু কোনও দিকে যেতে পারেন নি। দিন রাজা দণ্ড, নিন্দা করুন পণ্ডিতেরা বা বান্ধবেরা—তিনি জিনপিতা বুদ্ধদেবকে ব্যতীতে ক্ষণেকের জন্ত জীবিত থাকতে সমর্থ হবেন না—

“অধৈরাগ্য সমস্তভূতকরণা—প্রজ্ঞাদিনানাগুণ—

ফূর্জচন্দনপঙ্কসিন্ধু পতিতো গন্তং ক্ষমো নাত্ততঃ।

ভূপো বা যদি দণ্ডয়তি বিবুধা নিন্দন্তি বা বান্ধবা

মুঞ্চন্তি ক্ষণমপ্যহং জিনপিত জীবামি ন হ্যং বিনা ॥” ২৫

সত্যই কি তখনকার বঙ্গ সমাজ তাঁর বৌদ্ধধর্মে অন্তর্ভুক্তির জন্ত তাঁর প্রতি খড়্গাহস্ত হয়েছিলেন?

তারপর কবি-প্রার্থনা যখনই যে-ভাবেই থাকুক, সেখানে থেকেই যেন ভগবান্ বুদ্ধের কর্ণস্থধাত্রাবী গুণাবলীর প্রতি সমাকৃষ্ট থাকতে পারেন, তাঁর আর কোনও প্রার্থনা নেই—

“স্বর্গে বা বসতির্মমাস্ত গিরয়ে তির্থস্থ কিংবাস্থরে

প্রেতানাং নগরেহথবা নরপুরে কাপ্যাত্ততঃ কর্ণণা।

ভো সর্বগত ততস্ততস্তব গুণান্ কর্ণামৃতশ্রুদ্দিনো

নিষ্পাপানবলম্বতাং মম মনো নাস্তা স্থথপ্রার্থনা ॥”

এর পরবর্তী কবিতায় কবি ভগবান্ বুদ্ধকেই মাতা, পিতা, স্বস, ভ্রাতা, ইহকাল, পরকাল প্রভৃতি সবকিছু—বলে বলছেন—

অধিগতামৃত বুদ্ধ মনোভষুজং

মম তবানঘ গন্ধকুটীয়তাম।

গ্রন্থের শেষে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং স্বদেশ সযুদ্ধে উল্লেখ সর্বশেষ কবিতা এবং গ্রন্থের পুষ্পিকায় :—

“ভাষন্তাহুকুলাধ্বজয়মিহিরে রাজাধিরাজেশ্বরে

শ্রী লক্ষ্মীপতো পরাক্রমভূজে নীত্যা মহীং শসতি।

শ্রীশ্রীবুদ্ধ যশোধরা

সদগৌড়ঃ কবি ভারতী ক্ষিতিপুরঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বধীঃ

শ্রোতৃগামকরোং স ভক্তিশতকং ধর্মার্থমোক্ষপ্রদম্ ॥ ১০৭

ইতি শ্রী শাক্যমুনের্ভগবতঃ সর্বজ্ঞশ্চ পরমোপাসকেন গৌড়দেশীয়েন

শ্রী বৌদ্ধাগমচক্রবর্তিনা ভূস্বরেণ আচার্যেণ মহাপণ্ডিতেন

বিরচিতং ভক্তিশতকং সমাপ্তম্ । (১)

ধারণী ও তন্ত্র

ধারণী বা নানা বীজমন্ত্র, ঝাড়ফুক, যাহুমন্ত্রাদি সংবলিত বৌদ্ধ গ্রন্থের সংখ্যা অগণনীয়। ক্ষুদ্রতম প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ সমূহও ধারণীরূপে ব্যবহৃত হয়। অপরিমিতায়ুঃস্থত্র বা মেঘস্থত্র প্রমুখ মহাযানগ্রন্থও প্রকৃতকল্পে ধারণী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

মন্ত্রযান ও বজ্রযান এই উভয় যানাবলম্বী বৌদ্ধেরাও মহাযানেরই অন্তর্গত। মন্ত্রযানী বৌদ্ধদের পক্ষে মন্ত্রের সাহায্যেই বিমুক্তি সম্ভব এবং বজ্রযান বৌদ্ধদের পক্ষে মন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও বজ্রের সহায়তা ও মুক্তির পক্ষে সমধিক প্রয়োজন।

তন্ত্রগুলিই হচ্ছে মন্ত্রযান ও বজ্রযান বৌদ্ধদের বিশেষ সাহিত্য। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিকে অবশ্য শাক্ততন্ত্রসমূহ থেকে পৃথক করে নিতে হবে। বৌদ্ধতন্ত্রসমূহকে ক্রিয়া, চর্চা, যোগ ও অহুত্তরযোগ—এই চারভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। অহুত্তরযোগতন্ত্রগুলি রহস্যবাদে পরিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সাধনমালার নামোল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। এ গ্রন্থে ৩১২টি সাধন আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি গণ্ডে এবং কতকগুলি পণ্ডে রচিত। অনেকগুলি সাধনে রচয়িতার কোনও নাম নেই; কিন্তু কয়েকটি সাধনের রচয়িতৃবৃন্দের নাম গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে। খ্রীষ্টীয় ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে এই “সাধন”গুলি বিরচিত হয়। এই সকল গ্রন্থকারের উল্লেখ অত্যন্ত গ্রন্থেও আছে এবং

(১) ১৮২৬ সালে দার্জিলিং বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং শ্রীশীলস্বল্প স্ববির কর্তৃক সংশোধিত।

তাদের কদম্বকল্পনের রচিত অত্র গ্রন্থও আছে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রসিদ্ধ ইন্দ্রভূতি (খ্রীষ্টীয় ৬৮৭—৭১৭র নিকটবর্তী সময়ে প্রাদুর্ভূত)। ইনি জ্ঞানসিদ্ধি এবং অত্যাশ্চর্য্য কয়েকটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। এই ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভবই তিব্বতে লামা ধর্মের প্রবর্তন করেন।

এই স্মৃগৃহীত নামধেয় পদ্মসম্ভবেরই ভগিনী লক্ষ্মীংকরা। তাঁর রচিত “অম্বর-সিদ্ধি” নামক গ্রন্থ বঙ্গদেশ ও পরিপার্শ্বস্থ দেশসমূহে, বিশেষতঃ, তিব্বতে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

লক্ষ্মীংকরা অতি উচ্চদরের সাধিকা ও মহীয়সী বিদুষী রমণী ছিলেন। তিনি একটি বিশেষ নবভাবের—বা মতবাদের প্রবর্তয়িত্রী। তাঁর সময় পর্যন্ত বজ্রযানান্তর্ভুক্ত বৌদ্ধগণ পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের ও তাঁদের ভাগ-উপরিভাগের পর্যায়ীভূত মূর্তিসমূহের উপাসনা করতেন। তাতে অনেক কঠোর তপশ্চর্চাদির অল্পসরণ করতে হতো। লক্ষ্মীংকরাই সর্বপ্রথম বিধান দিলেন যে উপবাস, ব্রতচার, প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন নেই—এই সকল নাগপাশ ছেদন অত্যাবশ্যক। অথবা দারু, প্রস্তর বা মৃত্তিকানির্মিত দেবদেবীসমূহের সম্মুখে পূজাদানেরও কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন যে যেই দেহ সমস্ত দেবতার বসতিস্থল, সেই দেহ সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এটিই হচ্ছে বঙ্গদেশে সুবিদিত সহজিয়া-তত্ত্ব, যার উদ্ভাবয়িত্রী হচ্ছেন এই মহীয়সী জননী লক্ষ্মীংকরা। তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর তত্ত্বটির উল্লেখ করছি :—

“ন কষ্টকল্পনাং কুর্বাৎ নোপবাসো ন চ ক্রিয়াম্।

জ্ঞানং শৌচং ন চৈবাত্র গ্রামধর্মবিবর্জনম্॥

ন চাপি বন্দয়েদ্দেবান্ কাষ্ঠপাষণমুন্নয়ান্।

পূজামশ্বেব কায়স্থ কুর্বাণ্মিত্যাং সমাহিতঃ॥

* * *

পূজয়েদেবতাঃ সর্বা দেহস্থান্তরভাবনৈঃ”

অবশ্য তিনি এও বলেছেন তব্ব যাদের কাছে সুপরিজ্ঞাত, তাঁদের জ্ঞাত অশন, উপাসন প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে নিয়ম শিথিল করা চলে।

ভারত মাতৃপুত্রার দেশ। এখানকার ভক্তেরা অল্প সব সঙ্ক বা উপেক্ষা করতে রাজী আছেন, কিন্তু মাতৃভাতির কোনও প্রকার অবমাননা তাঁরা সহিতে বা মেনে নিতে পারেন না। জননী লক্ষ্মীংকরাও বলেছেন—

“সর্ববর্ণসমুদ্ভূতা জুগুপ্সা নৈব ঘোষিতঃ।

সৈব ভগবতী প্রজ্ঞা সংবৃত্যা রূপমশ্রিতা ॥”

অর্থাৎ নারীদের প্রতি কোনও বর্ণের লোকই কোনও প্রকার উপেক্ষা বা অবমাননা প্রকাশ করবেন না। কারণ—নারীই স্বয়ং ভগবতী প্রজ্ঞা, ছদ্মবেশে নারীর রূপ ধারণ করে আছেন।

এই জগত্ই বৈদিক ঋষিরা জননী বাগ্‌দেবীর হাতে ধ্যানের বীণা তুলে দিয়েছিলেন—সরস্বতীই সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

নারীরাই জননী জগদ্ধাত্রী শ্রীশ্রীচণ্ডীর অংশসমুদ্ভূতা, চণ্ডীতেও উল্লেখ আছে—

“বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ

জিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্ব ॥”

জীবন্ত দেবীদেরই পূজাতেই পরমা দেবীর পূজার সার্থকতা রূপায়িত হওয়াই শাস্ত্রের লক্ষ্যীভূত।

লক্ষ্মীংকরা “গুরু”র উপরও জোর দিয়েছেন—

“আচার্ধ্যং পরতরং নাস্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।

যশ প্রসাদাং প্রাপ্যন্তে সিদ্ধয়োহনেকধা বৃথৈঃ ॥” (১)

সহজিয়া যোগিনীদের মধ্যে “চিন্তা”র স্থানও অতি উচ্চে। তিনি খ্রীষ্টীয় ৭৬৫ সালের নিকটবর্তী সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি দারিকাপাদের শিষ্য এবং সংস্কৃতে তিনি “ব্যক্ত-ভাবানুগত-তত্ত্ব-সিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা

(১) হস্তলিখিত পুঁথি ৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করেছিলেন। এই গ্রন্থের একটি তির্যকীয় অলুপদও আছে। (১) চিন্তা বিজ্ঞানবাদিগণের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বতরাং এই জগৎটাই মনের সৃষ্টি—এই তিনি প্রচার করেছেন। তাঁর মতে সমস্ত দুঃখের কারণ হচ্ছে মনঃ, এবং ফলে মনঃই সমস্ত বিষাদের সৃষ্টি করে। প্রজ্ঞা এবং উপায়ও মনেরই সৃষ্টি, এবং এই উভয়ের সম্মেলনে চিত্তের মহাস্বখের উৎপত্তি হয় এবং ফলে, বাইরের সকল জিনিসেই ঐদৃশ চিত্তস্থ নিম্নে মহাচিত্তস্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মনঃ কখনও কখনও থাকে স্পষ্ট ; কখনও বা জাগ্রত ; কখনও মনঃ থাকে শুচি, কখনও বা অশুচি। কখনও মনঃ এক ও অবিভাজ্য ; কখনও বা তার বিপরীত। যোগী বাইরের সমস্ত বস্তুকেই শূন্য মনে করে স্বীয় মন বাহ্যবস্তুর চিন্তা ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত রাখবেন এবং ধীরে ধীরে বুদ্ধি প্রাপ্ত হবেন।

গ্রন্থের শেষে চিন্তা দেবী খুব বিশদভাবে বজ্রস্বের বর্ণনা প্রদান করেছেন এবং তাঁর মতে বজ্রস্ব কেবল আত্মসাধনলভ্য। বজ্রস্ব অতুলনীয়, কারণ তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই ; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী। তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ এবং মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রাধান্য প্রদান করেন—

“প্রত্যাহ্নবেছো ভগবান্ উপমাবর্জিতঃ প্রভুঃ ।

সর্বগঃ সর্বব্যাপী চ কৰ্তা হৰ্তা জগৎপতিঃ ।

শ্রীমান্ বজ্রস্বোহসৌ ব্যক্তপ্রভাবপ্রকাশকঃ ॥”

এখনও পর্যন্ত অভ্যর্থনীয় ও ভারতীয় সকলেরই একটা বিশ্বাস আছে যে পালি-ভাষাই বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতির মূল আধার। বিশ্বের অনেক স্থপতিতেরাও ঠিক জানেন না যে সংস্কৃত ভাষায় অজস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল—পালিভাষার থেকে সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর সংখ্যক বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এই সকল গ্রন্থ নেপাল, ভূটান, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি উত্তর-অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সর্বমুগে

(১) বৌদ্ধগান, অলুক্রমণী, ৯৬ পৃঃ।

সর্বসময়ে ভারতীয় প্রতিভা সংস্কৃতির মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ লাভ করেছে। হরদৃষ্টবশতঃ, অজস্র সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থেরও নামোল্লেখ পাওয়া গেলেও বহু গ্রন্থ এখন আর মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরিশ্রম সহকারে পৃথিবীর দিগ্বিদিকে অনুসন্ধান করলে মূল যে পাওয়া যাবে না, এমন মনে হয় না। এখনও চীন, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলে কত সহস্র পুঁথি আছে, বেগুলির সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলী কিছুই অবগত নন। রুশ, ইতালী প্রভৃতি অঞ্চলের মনীষীরা এখনও কিছু কিছু রত্নের সমুদ্বারে সমর্থ হচ্ছেন।

গবেষণার ফলে এটি সুস্পষ্ট দাঁড়িয়ে গেছে যে পালি ত্রিপিটক গ্রন্থগুলির সংস্কৃত মূলও ছিল। এবং পালি ও সংস্কৃত অনেক গ্রন্থের কোনটি পূর্বকার, কোনটি পরের—সেটা বলাও এখনও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

যে সাহিত্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষ এই সুদীর্ঘকাল অনবহিত ছিল, বাংলা দেশ যদি সেই সাহিত্যের প্রকৃষ্ট সমুদ্বারে অগ্রণী হয়, সেটি পরম সুখের বিষয় হবে। ভারতের সমস্ত শুভ কাজে, শুভ আন্দোলনে—বঙ্গদেশে অগ্রণী হয়েছেন। এ বিষয়েও তাঁরা অগ্রণী হবেন, এটিই প্রবন্ধের উপসংহারে লেখকের বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ

অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

রুদ্রদেবের চৈত্রসংক্রান্তিতে পূজার বিধান। তাঁর রোজ প্রতাপ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস ধরে প্রকটিত হয়; ধূলার ধরণী হয়ে ওঠে সন্তপ্ত; মহাকবি ভবভূতির ভাষায় এই সময়ে টিকটিকি তৃষ্ণার জ্বালায় অজগর সাপের গায়ের স্বেদজল পান করে—“অজগর স্বেদদ্রবঃ পীয়তে”। অথচ রুদ্রদেবের রুদ্রস্বে হৃদয়দেশ থেকে করুণার স্রবধুনী ধারা নির্গত হয়ে সমস্ত দেশকে

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ

১৪৫

ধন্য করে, সুস্বিষ্ট করে, শান্ত করে, করে সমাহিত—তার দিকে মহাকবি করলেন দৃষ্টিক্ষেপ, বললেন তিনি—

“সহস্রগুণমুৎসৃষ্টমাদত্তে হি রসং রবিঃ”—অর্থাৎ করুণার বারি সহস্র সহস্র গুণে পৃথিবীর বুকে ঢেলে দেওয়ার জন্তই তো ভগবান সূর্য ধরণীকে রুদ্ধদহনে জালিয়ে পুড়িয়ে থাক করেন—ধরণীকে শীতল করার জন্ত যতবার যত মহৎ দান ধরার বুকে নেমে এসেছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছুটি দানই রুদ্ধদেব বৈশাখের দেওয়া—খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ সালে বৈশাখ পূর্ণিমায় এবং খ্রীষ্টীয় ১৮৬১ সালের ২৫শে বৈশাখ তাঁদের নবদেহে অবতারণা।

এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের ধর্ম, দর্শন ও নীতি বিষয়ক নীতিবাদের সমালোচনার অবতারণা করবো। রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে সমস্ত হৃদয় উজাড় করে দিয়ে শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের প্রতি নিজের শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যর্থ্য নিবেদন করেছেন, এই প্রবন্ধে শুধু তারি কিছু উল্লেখ করবো। পরিশেষে গ্রন্থের “বুদ্ধদেবের প্রতি” কবিতায় তিনি বলেছেন—

“চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু

আয়ু কর দান।

তোমার বোধন মস্ত্রে হেথাকার তন্ত্রালস বায়ু

হোক প্রাণবান্।

খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোরুক শব্দধ্বনি

ভারত-অঙ্গন তলে আজি তব নব আগমনী.

অমের প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—

এনে দিক অজ্ঞেয় আস্থান।”

“কথা ও কাহিনী”তে “শ্রেষ্ঠভিক্ষা” শীর্ষক কবিতায় বুদ্ধদেবের কি অপূর্ব শিক্ষার বাণীই না প্রচার করেছেন। অনাথ-পিণ্ড পথে পথে বুদ্ধদেবের জন্ত শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চেয়ে চলেছেন, কত লক্ষপতি লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে এলো;

ধনীর গৃহিণীরা এলেন বহুমূল্য আভরণ নিয়ে। অনাথপিণ্ড তা' গ্রহণ করলেন না—কিন্তু ভিখারিণী যখন গাছের আঁড়াল থেকে তার একমাত্র পরিধেয় বস্ত্রখানি দান করলেন, তিনি তাই “শ্রেষ্ঠ দান” রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর আকৃতি—

“ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান
দেহো তারে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে—”

এই পরম আস্থান জনসাধারণের হৃদয়কে কি অপূর্ব ভাবেই না আবিষ্ট করেছিল—ধনী নির্ধন সকলেই হলেন ভক্তি-বিনম্র—দরিদ্রা লাভ করলেন অর্হত্ব।

সংস্কৃত ‘অবদান শতক’ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পূজারিণী শীর্ষক যে কবিতা লিখলেন তাতে “শ্রীমতী” কি করে অজাতশত্রুর কঠোর আদেশ উপেক্ষা করে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন তারি পবিত্র কাহিনী সোনার অক্ষরে চিরতরে লেখা হয়ে গেছে। শ্রীমতী শ্রীকণ্ঠে পুররক্ষককে তার প্রেমের উত্তরে জবাব দিলেন—

“শ্রীমতী

আমি বুদ্ধের দাসী”। তারপর বিশ্বকবি বলছেন—

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখা।

সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে

প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃত

স্থূপ পদ মূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা ॥

এ কবিতারই নাটকীয় রূপ—নটীর পূজা।

“বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা” গ্রন্থাবলম্বনে বিশ্ব-কবির “অভিসার” শীর্ষক কবিতা। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত যৌবন মদমত্তা বাসব-দম্ভাকে বলেছিলেন, যেদিন

সময় হবে, সেদিন তিনি ফিরে আসবেন। সম্যাসী ফিরে এলেন তাঁর সমস্ত সেবা পরিচর্যা নিয়ে সেদিন, যেদিন বাসবদত্তার রূপলাবণ্যময় সমস্ত অঙ্গ বসন্তে ছেয়ে ফেলেছে এবং তাকে পুরবাসীরা নগর পরিখার বাইরে দিয়েছে ফেলে। এ ভাবে মূল্য প্রাপ্তিতে ফুটে উঠেছে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের এক বিচিত্ররূপ—ধনী নির্ধন সকলে সমান উৎকর্ষাতে তাঁকে ভক্তি নিবেদন করতো। সকালে যে পদ্ম ফুলটি ফুটলো তা' শ্রীবুদ্ধের হাতে তুলে দিয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। চারিদিকে দর কষাকষি, হাঁকাহাঁকি, মালী হুদাস অবাক হয়ে গেল—তখন ফুলটি বিক্রয় করার কথা ভুলে গিয়ে সে নিজেই ফুলটি শ্রীশ্রীবুদ্ধের হাতে দিল তুলে—প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন “কহ বৎস কি তব প্রার্থনা।” সে তখন বললো—

“প্রভু আর কিছু নহে

শুধু চরণের ধূলি এক কণা।”

ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বুদ্ধদেবের আদেশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানবের অন্ন সংগ্রহের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। অনাথপিণ্ডমহতা জননী ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া সেই ভার নিলেন যা' নগরের কোটিপতিরা গ্রহণ করতে সাহস করলো না। বললেন তিনি—

“ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া

তব আত্মা লইল বহিরা।

কামে যারা খাত্তারা

আমার সন্তান তারা

নগরীর অন্ন বিলাবার

আমি আজি লইলাম ভার।”

নটীর পূজা নাটকে একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের রূপরেখা ফুটে উঠেছে, তেমনি মালিনী, চণ্ডালিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ও বৌদ্ধযুগের কি সুন্দর

আলেখ্যই না চিত্রিত হ'য়েছে। বুদ্ধের উপাসিকা রাজকন্যা মালিনী সমস্ত জনসমাজে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্তু কি আকুল উৎকণ্ঠাই না প্রকাশ করেছেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সহস্র অত্যাচার কি বিনব্রভাবে ধৈর্য্যসহকারেই না সহ্য করেছেন। বসুম্নবগগে (ধর্মপদের শেষ ২৬ সংখ্যক বর্গ) এবং স্তূত-নিপাতের রাসেট্ট স্থত্রে ভগবান্ বুদ্ধ তো একি কথা বলেছেন—আমি তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলি যার পার অপার, পারাপার কিছুই নাই, যিনি জিতেজ্রিয় ও বিসংযুক্ত—যিনি ধ্যানশীল, আসক্তি রহিত কর্তব্যনিষ্ঠ, পাপবিমুক্ত এবং অর্হংপদপ্রাপ্ত।

যস্ পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি ।

বীতদরং বিসংঞুত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩

ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং ।

উত্তমথং অহুপ্পত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪

মালিনী নাটকের রাণীর মুখে, “ধর্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল, আর ধর্ম নাই?” এবং অত্যাগত বহুস্থলে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যকেই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করেছেন।

‘চণ্ডালিকা’ শাদুলকর্ণাবদানের ছায়াবলধনে রচিত। ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য, আনন্দের চণ্ডাল কন্যার দেওয়া জলপানে কোনও আপত্তি নাই। ‘পরিশেষ’ গ্রন্থের ‘বোরোবুদুর’, ‘সিন্ধাম’ এবং ‘বুদ্ধদেবের প্রতি’—এই কবিতাজুয়ে বুদ্ধদেবের প্রতি বিশ্বকবি তাঁর হৃদয়ের অকুজ্রিম ভক্ত্যর্থ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহাকবি ‘বুদ্ধদেবের প্রতি’ শীর্ষক যে কবিতা রচনা করেছিলেন, তা’তে বলেছেন—

চিন্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়,

আয়ু করো দান।

তোমার বোধনমস্ত্রে হেথাকার তন্ত্রালস বায়ু

হোক প্রাণবান্।

খুলে যাক বুদ্ধদেব, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অন্ধনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমের প্রেনের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃশ্বনি—
এনে দিক অজের আস্থান।

ম্যাক্সমুলার ও টকাহুস, হড্‌সন প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ সাহিত্যের যখন কিছু পুনরুদ্ধার সংসাধিত হলো, দেশ বিদেশে বিশেষতঃ অক্সফোর্ডে বৌদ্ধসাহিত্য কিছু মুদ্রিত হলো,—তার সাড়া পড়ে গেল নিখিল বিশ্বে, সে আজ দেড়শত বছরের আগের ইতিহাস। বঙ্গদেশে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও মহাকবি নবীনচন্দ্র সেই ভাবধারায় হলেন বিশেষ অমুপ্রাণিত। তাঁদের সেই উন্মাদনা প্রচোদনার পটভূমিকায় গৌরবময় আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের উপর বুদ্ধদেবের কি অপূর্ব প্রভাব ছিল, তা' ভগিনী নিবেদিতাও একস্থানে স্বন্দর করে বিবৃত করেছেন। কলিকাতাস্থিত ধর্মরাজিক চৈত্যাবিহারে বুদ্ধজন্মোৎসবে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ১৩৪২ সালের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছিলেন তিনি সেদিন—

“একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দির দর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বুদ্ধদেব একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন জন্মাইনি। সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?”

বুদ্ধোত্তর সর্বযুগে প্রতি মানবের মহামানবেরও মনে সেই একই কথাই ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হবেই—কি পুণ্যের দিন সেদিন ছিল, যেদিন ভগবান বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন—আমার ধর্ম সোজা ধর্ম, সমুদ্রের জলের আশ্বাদ সর্বত্র সমান—সর্বত্র সর্বসময়ে লবণাক্ত; আমার ধর্মেরও একটিমাত্র সার নিষ্কর্ষ নির্বাণ। কেবল একটি জিনিষই আমি শিক্ষা দিই—দুঃখ এবং দুঃখ নিবৃত্তি।

যুগ যুগান্তর থেকে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে যার ধর্ম পরিব্যাপ্ত, তিনি কত কোটি কোটি লোকেরই না দুঃখানল করেছেন নির্বাপিত। অস্বপালী, ইসিদ্দাসী, উব্বিরি প্রভৃতি নারীদের কতই দুঃখের জীবন - সকলেই প্রাপ্ত হলেন অর্হত্ব, তাই বিশ্ব জগৎ ভগবান্ বুদ্ধের চরণে নতি জানাচ্ছে -

“নমো ভগবতো অরহতো সম্মা সংবুদ্ধস্স।” যে বিশ্ববন্দ্য কবি অনবত্ত স্মরে রসে গন্ধে তাঁর শিফার মহামন্ত্র উচ্চারণ করে দেশবাসীকে পুনরায় শাস্ত্রত ধর্মে করলেন প্রবুদ্ধ, তাঁকেও আমরা তাঁর জন্মদিবসে সম্যক সংবুদ্ধ ভগবান্ অর্হতের মূর্ত প্রতীকরূপে প্রণতি নিবেদন করি।

সাধারণ সূচী

অ

অকুতোভয়া, ১৩৫
অকুন্তর নিকায়, ১১৫
অদয়সিদ্ধি, ১৪১
অভিধম্ম পিটক, ১১৫
অভিসময়ালঙ্কার, ১৩৬
অবদান কল্পলতা, ১৩২

অবদান গ্রন্থমালা, ১৩২,
অবদান শতক, ১৩১
অশোক, ২৬
অশোকাবদান, ১৩২
অশ্বঘোষ, ১২৪, ১২৭-২৮
অষ্টমহাশ্রীচৈত্য স্তোত্র, ১৩৬
অসঙ্গ, ১৩৫

আ

আগরতলা, ৬, ৭
আগর ফা. ৭

আতনাতির স্তম্ভ, ৭১
আনন্দ, ১২
আর্যদেব, ১৩৫

ই

ইংসিং, ১২২

ইসিদাসী. ৬৮

উ

উৎপলবর্ণা, ৬৮
উত্তরা, ৩৫

উদয়ন, ৩৫
উদয়মার্গিক্য, ৬
উপচালা, ৬২

ঋ

ঋষিপুস্তক, ৪২

এ

একনাথগ্রাম, ১২

এরকাপত্র, ৪০

ক

কণিষ্ক, ১২৯	কিসা গৌতমী, ৬৮
কপিলমুনি, ১০	কীর্তিধর, ৪
কল্পজন্মাবদান, ১৩২	কুমারজীব, ১৩৩
কাশ্যপবুদ্ধ, ৪৪	কৃষ্ণমালা, ৭
	কৌশাঘী, ১৯

খ

খুদ্ধকনিকায়, ৭৩, ১১৫	খেমা, ৬৯
-----------------------	----------

গ

গণ্ডব্যূহ, ১৩৪	গুস্তা, ৬৮
গুণভদ্র, ১৩৪	গোবিন্দমাণিক্য, ৫

চ

চণ্ডীশতক, ১৩৭	চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ, ১৩৫
চতুঃশতক, ১৩৫	চিন্তা, ১৪২-৪৩
চন্দ্রকীর্তি, ১৩৫	চলকাল, ৩৯
চাটিগ্রাম, ৫	

ছ

ছন্দক, ৩৮

জ

জম্বুদ্বীপ, ১২	জাতকমালা, ১৩০
জয়দেব, ২০	জেতবন, ৩৯

ত

তথাগতগুহক, ১৩৪	তিব্বতীয় ত্রিপিটক, ১১৯-১২২
ত্রিপিটক, ৩, ৮৭-৯০ ;	
নামাবলী, ১১৬ ;	
প্রচারের ইতিহাস, ১১৭-১২২	

সাধারণ সূচী

১৫৩

খেরীগাথা, ৭০	খ	
দশভূমিবিভাস সূত্র, ১৩৫	দ	দীপকর, ৭৩, ৮০
দশভূমীস্বর, ১৩৪		দেবদত্ত, ২
দিব্যাবদান, ১৩১		
ধারণা, ১৪০	ধ	
নঙ্গ, ৪২	ন	নির্বাণ, ৫৬
নাগার্জুন, ১৩৩, ১৩৫		
পঞ্চবঙ্গীয় কথা, ৩১	প	প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রশাস্ত্র, ১৩৫
পট্টাচার্য, ৬৮		প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ, ১৩৫
পদ্মসম্ভব, ১৪১,		প্রসন্নপদা, ১৩৫
পাটিক, ৩৬		
বাণভট্ট, ১৩৭	ব	বোধিক্ৰি, ১৩৪
বুদ্ধ, বিভিন্ন যুগে, ৮০—৮৩ ;		বৌদ্ধ নারী কবি, ৬৪
বিভিন্ন দেশে বুদ্ধদেবের ধাতুবিভাগ, ৮৪—৮৭		
বুদ্ধ বংশ পরম্পরা, ৭১—৭২		ব্রহ্মবিহার, ১২
বুদ্ধবাণী, ২৭		বোধিচিহ্ন বিবরণ, ১৫
ভদ্রকুণ্ডলকেশা, ৬৮	ভ	ভরদ্বাজ, ১২
ভদ্রকল্লাবদান, ১৩২		

১৫৪

শ্রীশ্রীবুদ্ধ যশোধরা

ম

মঞ্জুলী, ১৩৪

ময়ূর ভট্ট, ১৩৭

মহানামা, ২

মহার্মোদগল্যায়ন, ৩৮

মহাবল্লভ, ১২৪—২৬

মহাবৈপুল্যসুত্র, ১৩২—৩৪

মহাযান বিংশক, ১৩৫,

মাগন্ধিয়া, ৩৬

মাতৃচেষ্ট, ১২৮—২৯

মাধবী, ৬৬

মুক্তা, ৬৫

মূলশ্রী, ৩৭

মৈত্রেয়নাথ, ১৩৪

ম্যাক্সমুলার, ১২৩

য

যশোধরা, ২১

যুক্তিযষ্টিকা ১৩৫

যোগাচার, ১৩৫

র

রবীন্দ্রনাথ, ৭ ; ও বুদ্ধদেব, ১৪৪—

রাক্ষাসাট, ৬

রাজমালা, ৫

রামচন্দ্র কবি ভারতী, ১৩৭

রাহুল, ২৫

রোহিণী, ৬৮

ল

লক্ষ্মণ সেন, ১৩৭

লক্ষ্মীকরা, ১৪১—৪২

লক্ষাবতার, ১৩৪

ললিতবিস্তর, ১২৬—২৭

ব

বঙ্গীশ, ৪৪, ৪৫

বভ্ৰুসী, ৬৯

বহুবন্ধু, ১৩৬,

বিজ্ঞানবাদ, ১৩৫

বিনয় পিটক, ১০—২৩

বিষ্ণুপ্রিয়া, ২১

বৈসিষ্ঠি, ৬৮

সাধারণ সূচী

১৫৫

ন

শাকবৃক্ষ, ১০

শাদুলকর্ণাবদান, ১৩২

শিষ্টোন্নয়ন, ১৩৪,

শিশুপচালা, ৬২

শুদ্ধোদয়, ১১

শ্রুততা সপ্ততি, ১৩৫

শ্রুতবাদ, ১৩৫

শৈলা, ৬৭

শ্রাবস্তী, ৩৪

শ্রাবস্তী, ৩৫

স

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ১৩৩

সপ্তজী, ৪০

সমাধিরাজ, ১৩৪

সামা, ৬২

সৌহা, ৬২,

স্বত্ব পিটক, ২৪—১১৪,

সুন্দরানন্দ, ২

সুপ্রভাতস্তোত্র, ১৩৬

স্বর্ণপ্রভাস, ১৩৪

সুমনসলমাতা, ৬৬

সুধশতক, ১৫৭

সেংখুম ফা, ২৩৬

স্বয়ম্ভূপুরাণ, ১৩৬

হ

হর্ষবর্ধন, ১৩৬,

হিরণ্যবতী, ১২

হীরাবন্ত থা, ৪

অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

১। **শ্রীশ্রীযশোধরা**। বুদ্ধদেবলীলাসঙ্গিনী জননী যশোধরার অপূর্ব জীবন কাহিনী। পতিপ্রচারিত ধর্মের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগের মহামহিমময় ইতিহাস। অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি এবং অধুনালুপ্ত বা আংশিকভাবে রক্ষিত পালি, সংস্কৃত, ভোটানী, চৈন, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত হুমূল্য গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত, অমূল্য জ্ঞান-সম্পদের যথাযথ বিস্তার ও বিশ্লেষণ। একটা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত নবাবিষ্কৃত বিষয়ে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সম্মত বিশদ আলোচনা ও ভারতে নারী প্রজাগরণের অপূর্ব মৌলিক ইতিহাস। ডক্টর চৌধুরী বিরচিত 'পঞ্চমাতুলীনা তত্বে'র (দুর্গা, সীতা, গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদামণি) ভূতীয় খণ্ড। (বস্ত্রহ)

২। **Position of Women in the Vedic Ritual.** Second edition. Rupees ten only.

৩। (খান-খানান আবদুল রহিমের ভাবী জীবনচিত্র সংবলিত) জাতকোদ্ধারণ পদ্ধতি। মূল্য ১০/- দশ টাকা

৪। **Sanskrit Poems on Mahomedan Rulers and Princes by Rudra Kavi.** Rs. 2/8/-

৫। **Khan Khanan Abdur Rahim and Contemporary Sanskrit Literature.** Vol. 2 of Contributions of Muslims to Sanskrit Literature Rs. 6/- only (Rexin bound). Vol. 1 of the same Series. Rs. 5/-.

৬। **Muslim Patronage to Sanskrit Learning.** Vol. I. 2nd Edition. Vol. II (In the press)

৭। Invaluable Sanskrit work "**Samudra Sangam**" by Md. Dara Sukoh with introduction and translation by Dr. Roma Chaudhuri. Rexin Bound Rs. 13/-

৮। **Sanskrit Poets of Mediaeval India** (ভারতীয় মধ্যযুগের সংস্কৃত কবি)—5 Vols. (Informations mostly from obscure Mss. Sources) About 2000 Pages in Print. Rs. 35/-

৯। **Sanskrit Historical Kavyas.** 5 Vols. More than 1500 pages of royal size in print. Rs. 23/8/-

১০। **Sanskrit Duta-Kavya-Samgraha.** Eight volumes.

Rs. 20/-

১১। **Contribution of Women to Sanskrit Literature.** Seven big Volumes. More than 3000 pages in print. Rs. 54/-

